মানবের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

পি, সি, সরকার এণ্ড কোং

২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার,
পি, সি, সরকার এণ্ড কোং,
[illegible], শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম পাঁচ সিকা

— প্রথম সংস্করণ —
আষাঢ়, ১৩৪১

প্রিণ্টার—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী
পুরাণ প্রেস
২১নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তক আমার বোনদিগকে উৎসর্গ করিলাম।

'বিচিত্রা' পত্রিকায় এই উপন্যাসটী প্রকাশিত হইয়াছিল। এর নামও খুঁজিয়া দিয়াছেন, বিচিত্রার পরিচালক শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, ডি, লিট্, এই কারণে বিচিত্রার সম্পাদক ও পরিচালকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বালিগঞ্জ
আসাঢ়, ১৩৪১। শ্রীসুবোধ বসু।



মানবের শত্রু নারী

এক

জ্যোৎস্নাসিক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া একটা রেলগাড়ি রক্ত-চক্ষু দানবের মত ছুটিয়া যাইতেছে। প্রান্তরের মাঝে মাঝে কোথাও জল জমিয়া,—তাতে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্‌মিক্‌ করে। বিস্তৃত শস্য ক্ষেত অস্পষ্ট পড়িয়া আছে, যেন নিদ্রায় আচ্ছন্ন এবং হঠাৎ-বাতাসে ঘুমের মধ্যেই শিহরিয়া উঠিতেছে। দিকচক্ররেখার কাছে তাল ও সুপারি গাছের ছায়া-ছবি যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। এবং শেষ রাত্রের বিশীর্ণ চাঁদ কেবলই ম্লান হইয়া চলিল।

গাড়ির একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরার জান্‌লার ধারে বসিয়া যে বাহিরের এই ছবি দেখিতেছিল, সে যুবকটি আর যাই হোক, কবি নয়। শেষরাত্রে ঘুম ছাড়িয়া ঘুমন্ত পৃথিবীর দৃশ্য দেখিবার স্পৃহা তার কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু একি আর কবিত্ব করিবার জন্য সে উঠিয়া বসিয়াছে? কিন্তু ঘুম নিতান্তই না আসিলে কি আর করা যায়। জান্‌লা দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া দিয়াছে শুধু এই জন্য যে মাথাটা ঠাণ্ডা হইলে

যদি ঘুম আসে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘুম অত্যন্ত দরকারী,—ব্যায়ামের মত। কিন্তু ঘুম না আসিলে কি আর করা যাইবে। অগত্যা সে এলোমেলো চুলগুলি আঙ্গুল দিয়া আঁচড়াইয়া বালিশের তলা হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিল। এমন হইবে জানিলে কে আর সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কিনিয়া টাকা খরচ করিয়া মরিত!

তবে যাই হোক, বইখানা উপাদেয়,—পড়া চলে। নিছক প্রেমের ছিঁচকাঁদুনী নয়, গভীর জ্ঞানের কথা। বইটির নাম,—'মানবের শত্রু নারী'। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত নারীসম্বন্ধীয় পুস্তক। এই বইটা অরুণাংশুর কাছে গীতার মত হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ উপদেশ সে এখান হইতে নেয়। কারণ ন্যাকামী সে পছন্দ করে না এবং কবিতাকে সে ঘৃণা করে। তার কাপড় জামায়, তার সমান করিয়া ছাঁটা চুলে, তার শুঁড়ওয়ালা চটিজোড়ায় তার কোমলত্ব বিদ্রোহের সাক্ষ্য দেয়। শুধু মাত্র প্রেমের কথায় ভরপূর বলিয়া অরুণাংশু উপন্যাস পড়া ছাড়ান দিয়াছে, এবং তার বদলে পড়ে মুলারের ব্যায়ামের বই, ক্যাপ্টেন্ কুকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, চেম্বার অব কমার্সের বাৎসরিক বিবরণী, ও সব চাইতে বেশী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বিখ্যাত 'মানবের শত্রু নারী'।

অনেকবার সে বইটা সারা করিয়াছে, কিন্তু তবু পড়ার কামাই নাই। এখনো বিশেষ মনযোগের সাথে 'মানবের শত্রু নারী' পড়িতেছিল। মাঝে-মাঝে হাত ও মাথা নাড়িয়া বইয়ের ভাব-বস্তুর সাথে তার যে মনের একান্ত মিল তাহা জানায়। একটু অগ্রসর হইতেই লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া একটা জায়গা চোখে পড়িল,—'সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই নারী বর্জ্জনীয়া। এই নারীই জগতে শোক, তাপ,

বুদ্ধি-ভ্রংশ ও কলহ টানিয়া আনে, এবং একপাল কালো কুৎসিত সন্তানের জন্ম দিয়া জগত অন্ধকার করিয়া তুলে।'

তর্জ্জনী ও ঘাড় নাড়িয়া অরুণাংশু অত্যন্ত বেশী রকম সায় দিল। কিন্তু মাথা উঠাইতেই চোখে পড়িল গাড়ির দেওয়ালের এক জায়গায় স্যানাটোজেনের বিজ্ঞাপন,—এক বিলাতী তরুণীর ছবি। অরুণাংশু মুখ বিকৃত করিল। ভ্রূ কুঁচকাইয়া একটু ভাবিল, একবার 'মানবের শত্রু নারী'র দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিল, তারপর উঠিয়া গিয়া বিজ্ঞাপনটার উপরকার হুক-এ বর্ষাতিটা ঝুলাইয়া দিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিবার জন্য যেই মুখ ফিরাইয়াছে, দেখে ফ্লোরে এক টুকরা কাগজে একটি মেয়ে ওভেলটীন্ তৈরী করিতেছে। গভীর বিতৃষ্ণায় অরুণাংশু জুতা দিয়া মাড়াইয়া বার্থের তলায় ঠেলিয়া দিল। স্বামী প্রস্তরানন্দ এদের কাছ হইতে শতহস্ত দূরে থাকিতে বলিয়াছে, সেটা ভুলিলে চলিবে না। বিছানায় গিয়া বসিয়া পড়িতেই তার কিন্তু মনে হইল একটা বইয়ের উপর বসিয়া পড়িয়াছে। উঠাইলে দেখা গেল সেটা টাইম-টেবল্,—আর একী, পরিত্রাণ নাই নাকি কোথাও,—টাইমটেবল্এর উপরটা সিগারেটের বিজ্ঞাপন,—একটা বিলাতী মেয়ে সিগারেট টানিতেছে। অরুণাংশু নিতান্ত রাগিয়া গেল। টান্ দিয়া উপরের পাতাটা ছিঁড়িয়া জানলা দিয়া সেটা বাহিরে ছুঁড়িয়া মারিয়া তবে তার রাগ কমিল। লজ্জাকর,—মেয়ের মুখ দেখাইয়া সকল আহাম্মুকগুলি নিজেদের জিনিষপত্রের খরিদ্দার জুটাইতে চায়!

যাক, আবার হেলান দিয়া সে 'মানবের শত্রু নারী'কে চোখের

সমুখে মেলিয়া ধরিল। চমৎকার বই এইটি,—প্রত্যেক পাতায় ভারী সুন্দর সুন্দর লাইন্ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের পুস্তক,—নইলে এরই মধ্যে আর তৃতীয় সংস্করণ হয় না কি! অরুণাংশু পড়িয়া গেল,—'অজগর সর্পের দৃষ্টিতে পড়িলে পশুপক্ষিগণ যেমন এক দুর্নিবার বেগে আকর্ষিত হইয়া তাহার খপ্পরে গিয়া পড়ে, তেমনই নারীর খর-দৃষ্টিতে পড়িলে, নরের আর রক্ষা নাই। অতএব বুদ্ধিমান নরগণ যেন এই পরম অরির ছায়া এড়াইয়া চলিতেও যত্নবান হন্। হায়, যে ভ্রান্ত পুরুষ একবার নারীর প্রকোপে পড়িয়াছে, তার আর দুর্গতির সীমা নাই।' অরুণাংশু ক্রমেই বুঝিতেছে, নারী ভয়ঙ্কর বস্তু। তার মা অবশ্য প্রস্তরানন্দের বর্ণনার সাথে মেলে না। কিন্তু নারী বলিলে কি আর মাকে বোঝায়! নারীর বিশেষ অর্থ হইতেছে,—যাক, সে তো সবাই জানে। সেই বিশেষ অর্থে নারী আতঙ্কেরই বস্তু।

নারীর ভয়ঙ্করতা কল্পনা করিয়া অরুণাংশু শিহরিয়া উঠিল। হায়, স্বামী প্রস্তরানন্দের বইখানা যদি তার হাতে না আসিত তবে এই বিপদ-সঙ্কুল সংসারে কত মুস্কিলেই না তাকে পড়িতে হইত।

বড় একটা ষ্টেশান্ আসিয়া পড়িল। গাড়ির গতি কমিয়াছে,—অদূরে বিস্তর বিজ্‌লী-আলোর দেয়ালী সুরু হইল। তারপরই, কুলী চাই, পান সিগ্রেট, চা গরম্, চেঁচামেচি। হুঁসিয়ার,—লগেজ যাইতেছে! কিন্তু সে সবে মনযোগ দিবার অবকাশ অরুণাংশুর নাই। শব্দ আট্‌কাইবার জন্য জান্‌লা আটকাইয়া দিয়া সে 'মানবের শত্রু নারীর' একটা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ জায়গা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িতে লাগিল।

মানবের শত্রু নারী

'নারীর হাস্য, নারীর লাস্য, নারীর কণ্ঠ সকলই পুরুষের জন্য বাগুড়া বিস্তার করিয়া আছে। এতএব সাধু সাবধান্'।

প্ল্যাটফর্ম্মে সেই গাড়িটার দরজার ধারে তখন দুজন যাত্রী আসিয়াছে। তখন অরুণাংশু যদি তাদের দেখিত তবে কে জানে হয়ত সে ভিতর হইতে ল্যাচ-কী টানিয়া দিত কিনা। তাদের মধ্যে একজন একটি তরুণী মেয়ে, আর তার সঙ্গে তার চেয়ে কিছু ছোট তার ভাই। সঙ্গে কুলীদের মাথায় পোর্টম্যাণ্টো, সুটকেশ, হোল্ড-অল্,—বিস্তর জিনিষপত্র। মেয়েটি গাড়ির দরজায় কাছে লট্‌কানো কার্ডটা পড়িয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মোটগুলি উঠিয়ে ফেল ভাই, আমাদেরই বটে। ছেলেটি নিজে গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়া কুলীদের দিয়া মাল উঠাইতে লাগিল, আর মেয়েটি নীচে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল সব কিছু উঠান হইতেছে কিনা।

প্ল্যাটফর্ম্মের আলোয় মেয়েটিকে দেখা যায় বেশ সপ্রতিভার মত। তনু-মধ্য দেহ, দাঁড়াইবার ভঙ্গীটাতে ওর সম্বন্ধে একটা মধুর ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্যের কোনো ধরাবাঁধা মাপকাঠি নাই। তবু ওর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে ও একটা হঠাৎ-খুসীর মত, সেই ধরণের মেয়ে, যারা জীবন সরস করিয়া তোলে। প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া [illegible] যখন মাল উঠানো দেখিতেছিল ও নানান্ যাত্রীর দিকে সকৌতূহল চোখে চাহিয়া একটা না-জানা খুসীতে টই-টম্বুর হইয়া উঠিতেছে, তখ[illegible] আমাদের অরুণাংশু নারীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য 'মানবের শ[illegible] নারী' হইতে আহরণ করিয়া প্রায় শিহরিয়া উঠিবার জোগা[illegible] হইতেছিল। শব্দ পাইয়া চোখ উঠাইয়া দেখিল একটি ছেলে, আর। [illegible]

ও মোট। কোন কথা না বলিয়া অরুণাংশু আবার বইয়েতে মনোযোগ দিল।

মোটমাট গুছান হইলে বাদল কুলীদের পয়সা মিটাইয়া দিতে নীচে আসিয়া নামিল। সুজাতা কত দিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দিতে উদ্যত হইতেই তার পৌরুষে আঘাত লাগিল। সে কহিল, সে তোমাকে বল্‌তে হবে না,—আমি বুঝি আর জানিনে কত দিতে হবে।

কত দিতে হবে বল তো ?

যা দেব, তার চেয়ে প্রথমটায় কম দিতে হবে।

'ওস্তাদ' বলিয়া হাসিয়া সুজাতা বাদলের পৌরুষের গর্ব্ব খর্ব্ব না করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া একজন অচেনা যুবাকে দেখিয়া সুজাতা প্রথমে একটু চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাঠমগ্ন অরুণাংশুর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া কি ভাবিতেই তার মনে পড়িল। রেণুকার দাদাকে সে চোখে দেখে নাই কখনো, কারণ তার বাবা মাত্র ছ-সাত মাস রেণুকাদের ওখানে বদ্‌লী হইয়াছে এবং তখন রেণুকার দাদা কলকাতায়। কিন্তু রেণুর দাদার ছবি দেখিয়াছে সে। এ ঠিক তারই মত। সুজাতা আবার তাকাইয়া দেখিল, গভীর মনোযোগ দিয়া অরুণাংশু বই পড়িতেছে !

রেণুর অ-দেখা দাদার সম্বন্ধে সুজাতার খানিকটা স্বপ্ন, খানিকটা কল্পনা না-বলা মায়ায় জড়ান ছিল। তার সাথে সুজাতার বিয়ে হইতে পারে এমনি একটা সম্ভাবনার কথা সে শুনিয়াছে। মনের মধ্যে তাই অনেক কথা ওঠে, অনেক হঠাৎ-সুর, অনেক মৃদু গন্ধ। কবিতার মধ্য

হইতে কুড়াইয়া পাওয়া, শ্রাবণ দিনের অশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে চরণ-ধ্বনি-শোনা', ঘুম-ভাঙা রাতে চমকিয়া-ওঠা' একটা কল্পনা!

রূপকথার রাজপুত্রের যেমন হওয়া উচিত অরুণাংশুর মধ্যে তার যে-টুকু ছিল মহা-আয়াসে সে তাহা দূরে রাখিয়াছে। অত্যন্ত এলোমেলো চুল, জামা কাপড়ে উদাসীন অনাদর, এবং খুব সে কাঁচাসোনার বর্ণ তাও বলা চলে না। কিন্তু তা হইলেও একটা প্রসন্ন স্বাস্থ্যের দীপ্তি তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

গাড়িতে যে কেহ প্রবেশ করিয়াছে তা অরুণাংশুর খেয়ালই নাই। সুজাতা ভাবিল হয়ত অত্যন্ত মজার একটা উপন্যাস হইবে। চাহিয়া কিন্তু আর সন্দেহ রহিল না। বইটির নাম,—'মানবের শত্রু নারী', স্বামী প্রস্তরানন্দ প্রণীত। অকস্মাৎ ওর ঠোঁটের উপর একটু স্মিত হাসি ও চোখে দুষ্টুমী খেলিয়া গেল।

এতক্ষণ পরে অরুণাংশুর মনে হইল নবাগত সহযাত্রীকে গন্তব্য জায়গার খবর জিজ্ঞাসা করিলে হয়,—অতটুকু ছেলে একলা একলা কোথায় যাইতেছে! মুখের সমুখ হইতে বই সরাইয়া সে বলিতে গেল, তুমি—। ওদিকে চাহিয়াই কিন্তু সে শিহরিয়া উঠিল। একী ভোজ-বাজী, ভানুমতীর তামাসা, আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ না কী? কোথায় সেই ছোক্‌রা,—তারই দিকে কৌতুহল-ভরা চোখে তাকাইয়া আছে এক,—হ্যাঁ, নারী। অরুণাংশুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া গেল। তারপর চোখ পড়িল কোলের বইটির উপর,—'মানবের শত্রু নারী'। অত্যন্ত হতভম্ব শঙ্কিত ভাবে সে জান্‌লা খুলিয়া বাহিরে মাথা বাহির করিয়া দিল, সেটা এমনই অকস্মাৎ হইল যে সুজাতার চোখ দুইটি কৌতুকে বড়

হইয়া উঠিল এবং অপ্রকাশ হাসিতে ঠোঁটের কোণা চকমক করিতে লাগিল। হঠাৎ তার মনে হইল, বাদলের এতটা দেরী হওয়া উচিত নয় তো। ও-দরজার দিকে যাইয়া চাহিয়া দেখিল বাদল মুটেদের উপদেশ দিয়া এই বুঝাইতেছে যে গল্পলোকের এক তন্তুবায় অতি লোভ করিয়া নষ্ট হইয়াছিল। সুজাতার তাড়ায় সে বক্তৃতা থামাইয়া আরো কিছু পয়সা দিয়া তাদের বিদায় করিল।

গাড়িতে-উঠিতে উঠিতে বাদল কহিল, মেয়ে মানুষকে অমনি করে ঠকিয়েই তো ওরা পয়সা নেয়। আমি হ'লে দিতুম নাকি আর পয়সা।

সুজাতা কহিল, কী কিপ্টে হচ্ছিস্ রে তুই! টাকা জমাতে চাস্ না কি!

বাদল কহিল, টাকা জমালে বুঝি এতদিনে আর সাইকেল কিনে ফেলতুম না?

গাড়ি ছাড়া পর্য্যন্ত দুই ভাইবোন্ দরজা আটকাইয়া তার ভিতর নিয়া মাথা বাহির করিয়া বাহিরের লোকজন দেখিতে লাগিল। অরুণাংশু আড়চোখে দু-একবার তাদের দিকে চাহিয়া প্রায় বিরক্তভাবে চোখ ফিরাইয়া 'মানবের শত্রু নারী'তে মনযোগ দিল। এবং গাড়ী ছাড়িলে দেখিল কোথা হইতে ওদের মুখে একবার লাল ও একবার নীল আলো পড়িল,—তারপর ওদের দরজা ত্যাগ এবং বইয়েতে অরুণাংশুর পুনর্ব্বার ভীর ম[illegible]ানিবেশ।

[illegible]ছুক্ষণ ধরিয়া গাড়িটা চলিতেছে। এদিককার বার্থটায় অরুণাংশু [illegible]জ মানবের শত্রু পড়িতেছে। মাঝের বার্থটায় বাদল শুইয়াছিল, [illegible]ম আসিতে তার মাত্র দেড় মিনিট লাগিল, দিদির পাহারা হইয়া যে সে

আসিয়াছে তাহা আর মনে রহিল না। ও-দিককার বার্থ-এ সুজাতা বালিশে হেলান নিয়া কোলের উপর একটা ম্যাগাজিন রাখিয়া বাহিরের অন্তহীন আবছায়ার দিকে, পাণ্ডুর চাঁদ ও দিকচক্রবালের মসীছবির দিকে চাহিয়া স্বপ্নালস চোখে বসিয়াছিল।

অরুণাংশু একবার তাকে তাকাইয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বনাশ, একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া সুজাতার কোলে, স্বল্পাবৃত হাতে, তার চুলে তার গলায় মুখে পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি সে মানবের শত্রুতে চোখ ফিরাইয়া নিশ্চিন্ত হইল! সুজাতা ও দু-একবার তার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল,—সমান তেজে সে মানবের শত্রু নারীকে সম্মান করিতেছে। শুধু কি তাই। কেবল কি আর পড়া, ঘাড় নাড়া, আঙুল দিয়া দাগান, উৎসাহের প্রাচুর্য্যে বেঞ্চিতেই ঘুসি এসব ক্ষণে ক্ষণে এমনি চলিতেছে যে সেদিকে চাহিয়া সুজাতার হাসি চাপা দায় হইয়া পড়িয়াছে। আদত ক্ষ্যাপা না হইলে অমন করে নাকি কেউ।

এবার অরুণাংশু এদিকে চোখ ফিরাইতেই সুজাতার সাথে চোখা-চোখি হইয়া গেল! এ কী? হাসিতেছে না কি ঐ মেয়েটা? ওর ঠোঁটের একটা কোণ হইতে কৌতুক হাসির একটা টুকরা যেন উঁকি মারিতেছে। আর ওর নাকও যে ফুলিয়া উঠিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। তার দৃষ্টি মানবের শত্রুতে পালাইয়া সে যাত্রা হাঁপ ছাড়িল। কিন্তু শান্তি নাই। দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছে অরুণাংশু। তার মনে হইল, তার গায়ে পিঠে, তার কাঁধে, তার চোয়ালে মেয়েটার দৃষ্টি স্পর্শ করিতেছে। এমন হইলে কার আর নিশ্চিন্ত পড়া চলে। কাজে কাজেই সভয়ে আবার সে এদিকে তাকাইল।

মানবের শত্রু নারী

সুজাতা তার দিকে তাকাইয়া কিছুতেই আর হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। অরুণাংশুর শঙ্কিত দৃষ্টি, ওর 'মানবের শত্রুর' উপর গভীর মনযোগ সব কিছুতেই তার বেজায় হাসি পাইতেছে। অরুণাংশু একান্ত অচেনা না হইলে, হয়ত সশব্দে হাসিয়া উঠিত। কিন্তু হাসির শব্দ না করুক, কৌতুকে ওর চোখ দুটি টল্‌মল্‌ করিতেছে। এই চোখের সাথেই অরুণাংশুর চোখ পড়িল।

অরুণাংশু-এই অভাব্য দুর্ঘটনায় মোটেই কাব্য-রসের খোঁজ পাইল না। প্রায় রাগান্বিত ভাবে সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া এমনি ভাব করিল যাতে মন হইতে পারে তার পৌরুষ গুরুতর জখম হইয়াছে। কিন্তু পুনরায় শক্তি পরীক্ষার মত সাহস জোগাড় হয় না,—তাছাড়া এবিষয়ে 'মানবের শত্রু নারী'ও নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু তা যাই হোক, এখানে অরুণাংশু নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে। ঘুম? অসম্ভব। যথেচ্ছা তাকান? পাগল নাকি,—তাকাইলেই তো ওটার সাথে—। না, আর পারা যাইতেছে না।

গাড়ি এখন ছোট্ট একটা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা তৃপ্তির গভীর শ্বাস ছাড়িয়া এক মিনিটে অরুণাংশু উঠিয়া পড়িল। বিছানাটা দেখিতে দেখিতে জড়াইয়া লইল। দুইটা সুটকেশ টানিয়া নামাইল। 'মানবের শত্রু নারী' বগলে, বর্ষাতিটার কথা মনে নাই। ঠেলিয়া ঠুলিয়া জিনিষপত্র দরজার কাছে উপস্থিত করিল। এ-কোঠায় আর একদণ্ডও নয়'—সসর্প গৃহে বাস করা আর এখানে থাকা প্রায় একই কথা।

সুজাতা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। এখানে নামিয়া যাইবে

নাকি এ! এই অজ-পাড়াগাঁর ইষ্টিশানে। বাঃ রে, কিন্তু এ যে রেণুর দাদা, তাতে একটু সন্দেহ নাই তা'র। ছবিই না হয় দেখিয়াছে সে, কিন্তু তাই বলিয়া চেনা যায় না বুঝি! অরুণাংশুর তোড়জোড়ের ঠেলায় এমন কি বাদল পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠিল। কুলী, কুলী—কোথায় কুলি। এ ইষ্টিশানে বাস করিতে কুলিও নারাজ। কাজে কাজেই স্বাবলম্বন প্রশস্ত উপায় এ কথাটা মনে মনে আওড়াইয়া অরুণাংশু ছাতা গুটাইতে লাগিল।

বাদল খাতির করিয়া বলিল, আপনি বুঝি এখানেই নাব্‌বেন? কোন্ গাঁ এটা। শুধুমাত্র গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া অরুণাংশু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। পাশের কাম্‌রাতেই জায়গা খালি ছিল, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তার নিজের গাড়ি হইতে বিছানাটা আনিয়া এখানে তুলিল। তারপর,—এইবার স্যুটকেশ নিতে হইবে। উত্তেজনার আতিশয্যে গার্ডের হুইসিল তার কানে ঢোকে নাই। কিন্তু যেমনই স্যুটকেশ তুলিতে যাইবে অমনি,—পুঁ, কটাঙ্ ঘটাঙ—গাড়ি ছাড়িল। আরে, এ কী মুস্কিল! বিছানাটা ও-গাড়িতে, স্যুটকেশ এ-গাড়িতে। যায় কোথায়। সর্ব্বনাশ, এ গাড়ীটাও যে আগাইয়া যাইতেছে। হাতছাড়া হইবে না কি শেষে। নিরুপায় হইয়া অরুণাংশু ছুটিয়া আগেকার গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িল।

বিস্মিত হইয়া সুজাতা ও বাদল তাকায়। সুজাতার মুখে সেই দুষ্টু হাসি,—কারণ ব্যাপারটা যে কি, তা বুঝিতে তার আর বাকি নাই। কি অদ্ভুতরে বাবা,—এই রকম ইষ্টিশানে এক মিনিটের বেশী গাড়ি থামে নাকি কখনো। এরই মধ্যে গাড়ি বদ্‌লান,—উঃ হাসি পায়!

মানবের শত্রু নারী

বাদল দিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া তারপর অরুণাংশুকে কহিল, এখানে নাম্‌লেন না বুঝি? কী বিশ্রী পাড়াগাঁ,—এখানে নাম্‌লেই মাটী। বোধ হয় ভুল করেছিলেন,—এটা আপনার জায়গা মোটেই নয়, তাই না?

গম্ভীর অসন্তুষ্ট মুখে অরুণাংশু কহিল, হুঁ—অন্ধকারে চেনা যায় না।

সুখে থাকিতে ভূতে কিলায় বলিয়া একটা কথা আছে। অরুণাংশুর নিজের দোষ নয়, ও অশরীরী জীবটিই তাকে দুর্মতি দিয়াছিল, নইলে এত হৈ-চৈ করিয়া ফল কি হইল? বিছানা-হীন বার্থ টাতো? একটা বালিশ ও নাই,—বাকীটা রাস্তা সটান্ বসিয়া কাটাইতে হইবে।

কিন্তু 'মানবের শত্রু নারী' তাকে সাহায্য করিতে আসিল। কী উপাদেয় গ্রন্থ, কী গভীর জ্ঞানের পরিচয়! পড়িয়া পড়ার আর তৃপ্তি মিটে না। নারীর সমস্ত দুষ্টামি স্বামী প্রস্তরানন্দ কী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এক সময় নিশ্চয়ই স্বামীজি নারী নিয়া নাড়াচাড়া করিতেন।

যতক্ষণ সুজাতার ঘুম আসিল না ততক্ষণ সে কৌতুক-রঙীন এক অকারণ স্নেহে পাঠ-মগ্ন অরুণাংশুর দিকে বার বার চোখ ফিরাইল। রাত্রি-শেষের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না গাড়ির ভিতর এক টুক্‌রা স্বপ্ন ডাকিয়া আনিয়াছে। ছায়া একটু, একটু আলো,—ধানের ক্ষেতের পরশ-লাগা একটু হঠাৎ হাওয়া।

দুই

মফঃস্বলের ঘোড়ার-গাড়ি একটা জীবন-মরণ ব্যাপার। প্রতিক্ষণে মনে হয়, চাকাগুলি গাড়ির সাথে বিদ্রোহ করিয়া তলা ছাড়িয়া অন্যদিকেই যেন গড়াইয়া চলিল। কিম্বা ঘোড়াগুলিই হয়ত কিছুটা দূর পর্য্যন্ত যাইয়া বলিয়া বসিল,—আর যাইব না মশায়। কিন্তু তবু এরাই ভরসা।

পরদিন ভোরে এমনি একটি গাড়িতে অরুণাংশু চলিয়াছে। তার সুটকেশ দুইটা দেখা যাইতেছে, এমন কি বর্ষাতিটা পর্য্যন্ত শেসতক ভোলে নাই। কিন্তু বিছানাটার কথা সতন্ত্র। সেটা নাই,—কিন্তু সেজন্য অরুণাংশুকে দোষ দেওয়া চলে না। নামিবার সময় ও-কাম্‌রাতে বিছানাটা খুঁজিয়া আর পাওয়া যায় নাই।

কোচ্‌ম্যান জিহ্বা দিয়া এক অদ্ভুত শব্দ করিয়া ঘোড়াগুলিকে দৌড়াইতে উৎসাহিত করিতেছে, চাবুক শাসান ও আঘাত কোনটারই কম্‌তি নাই,—কিন্তু সে-সমস্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ঘোড়াদুটি নিজের ইচ্ছাই বহাল রাখিল। কোথাও মিঠাইর দোকান,—মুদী হয়ত ঘরের ঝাঁপ খুলিতেছে, মাঝে মাঝে দু'একটা দালান,—তরকারির চুপরী লইয়া পসারিণী চলিয়াছে।

মফঃস্বলের সহরগুলি শরৎকালে পূজার গন্ধে ভরিয়া ওঠে। বর্ষাতে যে হাওয়া মাতাল হইয়া বেড়াইত কোথা হইতে তাতে শান্ততার ছাপ লাগিল,—উদ্দাম প্রেমের প্রশান্তির মত। শিউলির গন্ধ আসে ;—

প্রভাতগুলি যেন সোনায় তৈরী। কিন্তু অরুণাংশুর খুসী মোটেই এসব কারণে নয়। সে ভাবিতেছে, যাক্ গন্তব্যস্থানে পৌছান গেল,—মা বিস্তর খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে নিশ্চয়। আর গাড়ির এই অভদ্র ঝাঁকুনির পর তার ক্ষিধেটা যদি একটু বেশী ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তারপরই ঘুম,—সম্পূর্ণ দুদিন আর সে উঠিবে না,—অর্দ্ধেক রাত্রি জাগিয়া কাটান চালাকি নাকি? চোখের পাতা যে আর বশ মানে না!

গাড়ি সুস্থ শরীরেই তাকে বাড়ির সম্মুখে পৌছাইয়া দিল। একবার মাত্র গাড়ির দেওয়ালে মাথায় ঠোকা লাগিয়াছিল,—আর কিছু হয় নাই। চাকররা আসিয়া জিনিষপত্র নামাইতে লাগিল। বারাণ্ডায় মা ও রেণুকা দাঁড়াইয়াছিল, এবং উচ্ছ্বাস-সংযত যে অভ্যর্থনা সমস্ত প্রবাসী ছেলে তার মার কাছ হইতে পায় তাহা বাদ পড়িল না। ঘুমে ঢুলিয়া পড়া চোখ কচলাইতে কচলাইতে আসিয়া মাকে নির্ব্বাক এক প্রণাম,—কথা কহিবার মত অবস্থা তার নয়। রেণুকা দাদাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। কিন্তু সে অবসরটুকুও না দিয়া অরুণাংশু পাশের ডেক্-চেয়ারটাতে সটান্ শুইয়া চোখ বুজিল। আনন্দ করিবার কথা নয়,—সারারাত সে জাগিয়া আসিয়াছে এবং কখনো ভীত-শঙ্কিত ভাবে চাহিয়া দেখিয়াছে ঐ মেয়েটা তার দিকে মিটমিট করিয়া তাকাইতেছে। সমস্ত রাত যেন একটা দুঃস্বপ্নে কাটিয়া গেল।

মা'র জ্বালাতনে অবশেষে অরুণাংশুকে মুখ ধুইয়া আসিতে হইল। কিন্তু চোখে জল পড়াতেও তার ঘুমান্ধতা কিছুমাত্র কমিল না। কিন্তু চা খাওয়া দরকার। চা ও খাবার টেবিলে সাজান রহিয়াছে। একটা

চেয়ারে হেলান দিয়া অরুণাংশু খাইতে খাইতে ঘুমাইতে লাগিল। সমুখেই একটা চেয়ারে মা বসিয়া। বোন রেণুকা পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণাংশুর একবার মনে হইয়াছিল সে যেন শাহান্ শা, বাদশা,—চারদিকে সবাই তার অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। কিন্তু এখন শাহান্ শা'র বেজায় ঘুম পাইয়াছে। হুকুম করিবার মত অবস্থা তার নয়।

চায়ের কাপ মুখের সমুখে তুলিয়া ধরিয়া যেই একবার ঘুমে ঢুলিয়াছে অমনি খানিকটা চা ছিট্‌কাইয়া অরুণাংশুর গায়েই পড়িয়া গেল। তারা যেন বলিল,—ঠোঁট এবং পেয়ালার মধ্যে বিস্তর ফস্‌কানি! এই উষ্ণ তিরস্কারে অরুণাংশু যেই চোখ মেলিয়া চাহিল অমনি তার হাত ফস্‌কাইয়া পেয়ালাটা পড়িবি তো পড়, রেণুকার পায়ে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, উঃ, খুন করলে,—আলীবাবার ডাকাত করলে।

অরুণাংশু চোখ বুজিতে বুজিতে কহিল, চুপ!

মা দেখিলেন অরুণাংশুর প্রায় আফিং খাওয়া গোছের অবস্থা। তাই বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গাড়িতে ঘুমুস নি নাকি রে!

ঘাড় নাড়িয়া অরুণাশু জানাইল, না।

কেন? বার্থ রিজার্ভ করে আসতে বলেছিলুম যে।

অরুণের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা ছিলনা,—জবাব দিবার মতন অবস্থাও তার নয়। কিন্তু মা যদি একবার মনে করেন যে সে তার কথামত বার্থ রিজার্ভ করিয়া আসে নাই, তবে আর রক্ষা থাকিবে না। এমান তাকে বকিতে সুরু করিবে যে ঘুমাইতে আর দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে অরুণাংশুর মনে খেলিয়া গেল কালরাতের ভয়াবহ স্মৃতি, আর মনে

পড়িল 'মানবের শত্রু নারী'র লাইনগুলি,—'অজগর সর্পের খর-দৃষ্টিতে পড়িলে যেমন পশুপক্ষিগণ এক দুর্নিবার বেগে আকর্ষিত হইয়া তাহার খপ্পরে গিয়া পড়ে, তেমনি নারীর খর-দৃষ্টিতে পড়িলে নরের আর রক্ষা নাই।'

মা তখন বলিতে সুরু করিয়াছেন,—তোদের নিয়ে কী মুস্কিলে পড়েছি বাপু,—একশোবার করে লিখে দিলুম—

তাড়াতাড়ি অরুণাংশু কহিল, বার্থ রিজার্ভ করেছিলুম বৈকি।

তবে?

কিন্তু গাড়িতে কী ছিল জান?

কি?

অরুণাংশু গম্ভীরভাবে কহিল, সাপ, গোখরো সাপ।

মা শিউরিয়া উঠিলেন,—বলিস কিরে, সর্ব্বনাশের কথা। সাপ এলো কি করে গাড়িতে। তারপর?

মাটী করিয়াছে,—এর জবাব দিতে গেলে আর ঘুমাইবার আশা নাই। তাছাড়া অভ্যেস না থাকিলে তাড়াতাড়ি গল্প সাজান যায় নাকি। কিন্তু তার জন্য ভয় কি। কহিল, আর কথা বল্‌তে পারি না। বিষম ঘুম।

মা উঠিয়া গেলেও রেণুকা কিন্তু গেল না। দাদাকে যে জরি আনিতে বলিয়াছিল এম্ব্রয়ডারির জন্য, তা আনিয়াছে কিনা সে খোঁজটা নিতান্ত নেওয়া দরকার। শুধুমাত্র জরির অভাবে শেলাইটা সারা হইতেছে না।

অরুণাংশু এবার একবার চোখ ঈষৎ মেলিতেই রেণু কহিল, দাদা, আমার জরি এনেছো তো,—লিখেছিলাম যে।

নিরুত্তরে অরুণাংশু আবার চোখ বুজিল।

রেণুকা কহিল, শুধু বল এনেছ কি না,—আমিই খুলে নিইগে। বল না গো—

সাড়া নাই।

রেণুকা কহিল, কি, আর্মান বুঝি? ও দাদা?

অরুণাংশু ঘুমাইতেছে।

রেণু নাছোড়বান্দা। তার এত সাধের ফুলটার অবস্থা সঙ্কট-জনক। হয়ত মুকুলেই শুকাইয়া মরিবে! সে কহিল, বাঃ রে!

অরুণাংশু নাক ডাকিতেছে। উত্যক্ত হইয়া রেণুকা অরুণাংশুর চেয়ার ধরিয়া খুব ঝাঁকিতে লাগিল। তাতে কোনো ফল হইল না। আরো আয়াস করিয়া অরুণাংশু কাৎ হইয়া শুইল। দু-দিন আর সে উঠিবে না!

ঘুমটা হয়তো খুব গভীর হইয়াই আসিয়াছিল। আটচল্লিশ ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টাতে অরুণাংশু সুস্থ হইয়া উঠিল।

এখানে আসিলে সাধারণতঃ যে-ঘরটা তার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত সে ঘরে গিয়াই তো তার চক্ষুস্থির! এ করিয়াছে কি! বিছানায় পুরু গদী,— গদী-আলা চেয়ার, টিপয়-এর উপর ফুলদানীতে ফুল। সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই বিলাস, এই ভোগের ব্যবস্থা! হায় 'মানবের শত্রু নারী', তোমার এই অপমান। সংযম সম্বন্ধে এত উপদেশ যে এতদিন পড়িল তাকে এমন করিয়া আর কেউ মুখ-ভেঙচাইতে পারিত না। অবশ্য আগে এসবে তার অভ্যাস ছিল, এবং এটা স্বাভাবিকও ছিল। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, এর মধ্যে কত যুগ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বে মূর্খ

ছিল বলিয়া চিরকালই বুঝি তেমনি থাকিতে হইবে। 'মানবের শত্রু নারী' পড়িয়াছিল নাকি সে আগে কখনো।

বিছানার গদী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল! তার বিছানায় শুধু একটা সতরঞ্চ থাকিবে,—তার উপর বড় জোর একটা চাদর থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া গদী! সর্ব্বনাশের তবে আর বাকী কত? চেয়ারটা নিজেই বদ্‌লাইয়া লইয়া আসিল,—নির্জ্জলা কাঠ ছাড়া অন্য কিছুর উপর বসিতে স্বামী প্রস্তরানন্দ মানা করিয়াছেন। ফুল-টুলে তার প্রয়োজন নাই। আর কী আস্পর্দ্ধা বল, মেমের ছবি-আলা দিনপঞ্জিকা তার ঘরের দেওয়ালে! ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়াও অরুণাংশুর রাগ যায় না।

স্নান করিতে যাইবার আগেই সে ঘরটির এমনি চেহারা করিয়া গেল যে বাড়ির মেয়েরা দেখিয়া তো শিহরিয়া উঠিল। স্বামী প্রস্তরানন্দ হয়ত বা এমনই একটি ঘরের ছবি কল্পনা করিয়াছিলেন। ব্যায়ামবীর মুষ্টিবীর ও স্বামিজীদের ছবিতে দেওয়াল ছাইয়া গেল। হাতল-ছাড়া একটা কাঠের চেয়ার ও মমতাহীন বিছানা ঘরের মধ্যে যেন অনুস্বার ও বিসর্গ উচ্চারণ করিতে লাগিল। ঘরখানা যা দেখিতে হইলে তা মঠের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়াও সচরাচর সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া লাভ নাই।

দুপুরবেলা মহাআয়াসে হাতলহীন কাঠের চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া রাখিয়া অরুণাংশু 'গীতায় ব্রহ্মবাদ' পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে এক-রকম তন্ময়ই হইয়া গিয়াছিল,—এমন সময় দুপুরের রোদ আসিয়া তাকে খোঁচা দিল। দোতলার ঘরের এই দোষ,—সূর্য্যটা খানিকটা নিকটে

হয়। কাজে কাজেই ব্রহ্মাকে টেবিলের উপর অপেক্ষা করিতে বলিয়া অরুণাংশু জানালা আটকাইতে উঠিল।

এমন সময় তার ঘরের অন্যদিকের দরজা খোলার শব্দ হইল। চমকিয়া উঠিয়া অরুণাংশু সভয়ে দেখে তার মা,—আর শুধু মা নয়, তার সঙ্গে মায়েরই মত বর্ষিয়সী এক মহিলা। মহা হাঙ্গামা হইয়াছে,—সে কি চিড়িয়াখানার জন্তু না কি যে চেনা অচেনা সবাইকে ডাকিয়া দেখাইতে হইবে।

পার্ব্বতীদেবী একবার অরুণাংশু ও পরে সেই বর্ষিয়সী মহিলার দিকে চাহিয়া কহিল, এই আমার ছেলে দিদি। অরুণ, দিদিকে নমস্কার কর্।

অরুণাংশু মহা ফাঁপরে পড়িল। নমস্কার করিবে যাকে তাকে? বেশ তো! কিন্তু মা যখন বলিয়া ফেলিয়াছে তখন উপায় কি। অথচ নারীকে নমস্কার! দ্বিধা করিয়া মায়ের দিকে তাকাইতেই দেখে চোখ দিয়া তিনি অবাধ্য ছেলেকে নমস্কার করিতে ইসারা করিতেছেন। উপায়ান্তর নাই,—অন্তত মায়ের সম্মান রাখিবার জন্য দায়টা আর এড়ান যাইবে না। যাক্, এখন না হয় নমস্কারই করিল, তারপর ইনি চলিয়া গেলে মাকে জবাবদিহি করা যাইবে।

অরুণাশুর নত মাথাটায় হাত দিয়া মায়ের বন্ধুনী কহিলেন, থাক্ থাক্, বেঁচে থাক। ভাল দেখে বউ আসুক, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্।

এই কথায় অরুণাংশু অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে চোখ উঠাইল। যা-তা বলিবে না কি। স্বামী প্রস্তরানন্দের কাছে এর জন্য সে কী জবাব দিবে।

শুধু কি তাই? রেণুকা ঘরে ঢুকিতেছে। নিশ্চয়ই সে তার নমস্কার দেওয়া দেখিয়া ফেলিয়াছে। অপমানের তবে আর অন্ত নেই।

রেণুকা তো ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একী,—তার সাথে এ কে? সন্দেহ নাই, কাল রাত্রের ট্রেণের সেই মেয়েটা। এরা আরম্ভ করিয়াছে কি। তার ঘরেই এদের সব ভীড় কেন? মহা জ্বালাতন!

তারপর কী ভয়ানক, অরুণাংশুর ঘরেই ওরা কন্‌ফারেন্স সুরু করিয়া দিল।

পার্ব্বতীদেবী কহিলেন, তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ সুজাতা। বোর্ডিংএ ভাল করে খেতে দেয় না বুঝি?

সুজাতার জবাব শুধু এক টুক্‌রা হাসি।

সুজাতার মা সুপ্রিয়াদেবী কহিলেন, বেশি খেতে দিলেই আর কি হবে দিদি—ওরা খাবে বুঝি? তাতে ফ্যাশান্ নষ্ট হয় যে।

এই অভিযোগের জবাবও সুজাতা দিল একটুখানি হাসি দিয়া। অরুণাংশু আর ঘরে থাকিতে পারিতেছে না। এই রকম স্থানে থাকা তার আর হইতেই পারে না,—তা হইলই বা এটা তার নিজের ঘর। কেবল পালাইতে আর পৌরুষে যা একটু বাঁধিতেছিল, নইলে তার অবস্থা নিতান্তই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

সুপ্রিয়াদেবী একবার অরুণ ও পরে সুজাতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞেস করিলেন, অরুণ বুঝি তোদের সাথে কাল এক গাড়ীতেই এসেছে?

একবার অরুণাংশুর দিকে কৌতুক-ভরা চোখে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুজাতা কহিল, হ্যাঁ, কিন্তু বালিশ ছিল না বলে ঘুমুতে পারেন নি।

তোরা একটা দিলিনি কেন?

বাঃ রে।

পার্ব্বতীদেবী তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল না কি তোমাদের কামরায় একটা সাপ ছিল,—গোখরো সাপ?

গোখরো সাপ? অরুণাংশু টুথ-ব্রাশে পেষ্ট ঢালিয়া মুখে দিল,—নিশ্চয়ই তার দাঁত কেমন করিতেছে।

বিস্মিত হইয়া সুজাতা কহিল, সাপ? কই,—না।

অরুণাংশু তখন ঘন-ঘন টুথ-ব্রাশ চালাইতেছে। বারবার করিয়া দাঁত মাজা ভাল। তাছাড়া তার মুখও এদের সকলের হইতে অন্যদিকে ফিরিল। অরুণাংশুর দিকে বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া মা দেখেন সে প্রবলভাবে দাঁত মাজিতে মাজিতে দরজার দিকে চলিয়াছে। ব্যাপার কি! সুজাতাকে কহিলেন, তবে ও যে বল্লে সাপের জন্য সারা রাত ঘুমুতে পারে নি? সকৌতুকে সুজাতা বলিল, তাই বলেছেন না কি?

হ্যাঁ।

অকস্মাৎ প্রবল রুদ্ধ হাসিতে সুজাতার মুখটা টস্‌টস্ করিতে লাগিল। মাগো, কাণ্ড দেখ একবার! কিন্তু তার জবাব শুনিবার জন্য অরুণাংশু আর ঘরে নাই,—ইতিমধ্যে সে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

মা'রা চলিয়া গেলেও সুজাতা ও রেণুকা দুই সখী সেই ঘরেই রহিয়া গেল। রেণু সুজাতার চাইতে কিছু ছোট। ম্যাট্রিক দিয়াই পরের বার সুজাতার মত কলেজ-বর্ডিংএ থাকার সে উচ্চাভিলাস করে। উঃ, কলেজে পড়া যা মজা!

সুজাতা কহিল, কাল গাড়িতে যা তামাসা করছিল তোর দাদা,—মাগো, হেসে আর আমি বাঁচিনে।

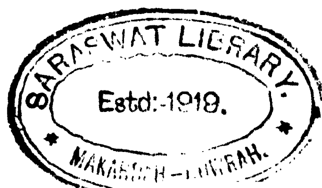
তাই নাকি ? কি করেছিলরে সুজাতাদি ?

সাপ কাকে বলেছে জানিস ?

কাকে ?

কাকে আর আমাকে। আমার সাথে চেনা থাক্‌লে দেখাতুম।

রেণুকার ব্যাপারটা প্রায় বোধগম্য হয় না। যে সময়ে হাঁ করিলেই মেয়েরা সব কথা বুঝিয়া লইতে পারে সে বিস্ময়কর সময় রেণুকার এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই। কিন্তু সুজাতার আসিয়াছে,—একটা অজানা মন্ত্রে তার সকল কল্পনা প্রখর হইয়া উঠিল।



তিন

সেদিন রাতে বর্ষা পড়িতেছে। চারিদিকে ঝুমঝাম শব্দ, কখনো বৃষ্টির ছাট্ আসিয়া গায়ে লাগে। সুজাতার বড় ভালো লাগিতেছে,—বিছানাটার অর্দ্ধেক হয়ত ভিজিয়া গেল, কিন্তু জানলা বন্ধ করিবার কথা তার মনেই হয় না।

চমৎকার এখানে বিষ্টি হয়,—জল-পড়ার শব্দটা কী যে ভাল! স্তব্ধ সহরটার চারিদিকে অন্ধকার, আর বৃষ্টিধারার পতনধ্বনি! সুজাতা ভাবিতেছে কত কিছু তার ঠিক নাই। কলেজ বোর্ডিং,—মায়ের তাড়ায় ছুটীর পনের দিন আগে চলিয়া আসিতে হইয়াছে,—হ্যাঁ, তারও ইচ্ছা ছিল বৈ কি। পথে মাসীমার কাছে দুদিন থাকা। এর মধ্যে লজিক পড়া যে কতটা আগাইয়া যাইবে কে জানে! সুপ্রভা, শিউলি, রেখা,—ওদের কাছে ক্রমে ক্রমে চিঠি লিখিতে হইবে। কলেজের অভিনয়ে ভূমিকা নেওয়া হ'লো না এবার। বোর্ডিং-এ থাকিলে হাসি গানে-গল্পে কল্পনায় জীবন টগ্‌বগ করে। কিন্তু এখানেও মা আছে, বাবা আছে,—আচ্ছা রেণুকার দাদা ঐ রকম করে কেন। পাগ্‌লাটে গোছের কেমন যে মানুষ, কিন্তু—দূর ছাই, কী মাথামুণ্ডু যে সব ভাবনা মনে আসে।

কাৎ হইয়া সুজাতা ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। এক দুই তিন,—ব্যস্ এইবার সে ঘুমাইয়া পড়িবে। হয়ত একটু স্বপ্ন দেখা, সম্পূর্ণ শান্ত

বিশ্রাম,—তারপরই ভোর হইবে। জীবনের খাতার আর একটা পাতা সকাল বেলার রোদে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রত্যেকটা দিন তার কল্পনায় ভরিয়া ওঠে।

জল-পড়ার শব্দ, বিছানাতে এক টুক্‌রা গাছের ছায়া, আর,—রেণুর দাদা চুলগুলি ভাল করিয়া আঁচড়ায় না কেন? কী ক্ষতিটা হইত তার তাতে। এমন করিয়া সুজাতা ঘুমাইয়া পড়িল।

সে-রাতে অরুণাংশু তখনও ঘুমায় নাই। তার জীবনেও সমস্যা আছে, তার কল্পনা নাই এমনও নয়। ডেভেলোপারটা ছিঁড়িয়া গেছে,—নতুন একটা না কিনিলে আর হইবে না। তার প্রাণায়াম শিখিতে বড় ইচ্ছা, কিন্তু সুবিধা মত সুযোগ পাইতেছে না। বদরীকাশ্রমটা নিশ্চয়ই একটা অপূর্ব্ব জায়গা। পাহাড়, পাইনবন, তুষার,—আর আশ্রমের শান্তি, আর,—আঃ মশা বড় জ্বালাতন করে। মফঃস্বল-সহরের তো ঐ দোষ,—সন্ধ্যা না হইতেই মশার কনসার্ট শুনিতে হয়!

বৃষ্টি পড়ার দরুণ স্বভাবতই অরুণাংশুর ঘুম পাইয়াছে। কিন্তু 'মানবের শত্রু নারীর' অন্তত এক অধ্যায় না পড়িয়া সে কখনো শোয় না। বইটা শুধু মাত্র নারী সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেয় নাই, কি করিলে এই মিথ্যা সংসার ত্যাগের আসক্তি জন্মে, কেমনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তাহার সমস্ত শর্ট-কাট্‌ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে।

অরুণাংশু যখন ঘুমাইতে গেল তখন কল্পনা করিবার মত অতটুকু ক্ষমতাও তার মাথার অবশিষ্ট নাই। চোখের পাতা দু'টি মগজের দরজা-খিল পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টি পড়ার শব্দে কোন সুর সে শুনিল না, তার বিছানায় গাছের ছায়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আসে,—মনির ধ্যানের

মধ্যে অপ্সরার মত,—কিন্তু অরুণাংশুর ঘুম স্বপ্ন প্রবেশ করিবার মতও ছিদ্র রাখেনা, এমনি তা মজবুত।

এম্‌নি চিন্তা-হীন নিদ্রা, যথেষ্ট খাওয়া আর রামকৃষ্ণ মিশানে ঘুরিয়া অরুণাংশুর দিন কাটিতেছে। মনের মধ্যে কোনও অভাব বোধ নাই, স্বপ্ন দেখিবার, কল্পনা করিবার অবসরের অভাব। গান শোনে, কিন্তু সুরের মোহে উচ্ছ্বসিত হয় না, কবিতা পড়িবার দরকার হয় না কখনো। কোনও গভীর রাতে ঘরে যদি জ্যোৎস্না আসিয়া প্রবেশ করে, কামিনী ফুলের গন্ধ আসে, তখন 'মানবের শত্রু নারী' পড়ে। কী উপাদেয় গ্রন্থ,—এমনটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার! কী পাকা জ্ঞানের কথা! হইবে না,—লেখা কার!

পরের দিনটা অরুণাংশুর পক্ষে সুদিন ছিল না। ভোর হইল তার আটটায়,—রৌদ্রে তখন চারিদিক জ্বলজ্বল করিতেছে। ডেভেলাপার টানিবে কখন? এই রোদ্দুরে একসারসাইজ করা যায় নাকি? বেশ তো একটা লোকও কি তাকে এতক্ষণে ডাকিতে পারিল না। এলার্ম ঘড়িটাকে না বদ্‌লাইলে আর চলিতেছে না,—একেবারে যাচ্ছেতাই হইয়া গেছে ওটা। নইলে অমন টুন্‌টুন্ করিয়া বাজে নাকি আবার!

এমন সময়ে তার ভোরের খাবার আসিল। অরুণাংশুর রাগটা পড়িল গিয়া খাবারগুলির উপরে। তারা যে নিতান্তই নিরপরাধ, পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে আসিয়াছে তা তার আর মনেই রহিল না। কুশের কাঁটা পায়ে বিঁধিয়া চাণক্য পণ্ডিত যেমন রাগিয়া উঠিয়াছিল শোনা যায়, অরুণাংশু তেম্‌নি ক্ষেপিয়া উঠিল। ঝন্‌ঝন্ চন্,—খাবারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল,—প্লেটটা অভিমানে ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।

রেণুকা কহিল, এ কী ?

ইচ্ছা।

বাপরে বাপ,—এত রাগ কেন ?

অরুণাংশু কহিল, যখন-তখন একটা খাওয়ার এনে দিলেই হ'লো। সময় জ্ঞান নেই,—রাক্ষুস নাকি আমি ?

রেণুকা দুষ্টুমি করিয়া কহিল, কী তবে ?

চোখ কচলাইতে কচলাইতে অরুণাংশু কহিয়া উঠিল, তবে রে লক্ষ্মীছাড়ী। তার সঙ্গে হয়ত তার কথার সুর মিলাইয়া কোন রকম ভঙ্গী দৃষ্ট হইয়া থাকিবে, রেণুকা 'মার্ লে—মাগো, মেরে ফেল্লে দাদা,'—বলিয়া দারুণ ভয়ের অভিনয় করিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পালাইল।

এইবার বাহিরে গিয়া কাহার উপর দোষ চাপান যায় তাহা কল্পনা করিতে করিতেই অরুণাংশু দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু সহসা কিসের সাথে হুচট্ লাগিল। নিচে চাহিয়া দেখিয়া,—অ্যাঁ কী এটা ? 'মানবের শত্রু নারী'—আরেঃ মাটিতে পড়িল কী করিয়া। নিশ্চয়ই কাল রাতে ঘুমের ঘোরে ফেলিয়াছিল,—টের পায় নাই। তাড়াতাড়ি উঠাইয়া বইটাকে সে কপালে ঠেকাইল, কোঁচার খুট্ দিয়া ঝাড়িল, এবং কি যে করিল না তাহাই বলা কঠিন। সামান্য বই নাকি এটা ?

কিন্তু তালিকা এইখানেই শেষ নয়।

দুপুরের খাওয়াটা তার মাটি হইল। যে-ভাতের মাড় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তা সে খায় না। কিন্তু বামুনটা এমনি আহাম্মক যে সে-কথা তার মনে নাই! তাছাড়া আজ হইতে নিরিমিষ খাইবে

বলিয়া মাকে আগেই জানাইয়াছিল। কিন্তু তার এ কী ফল! অরুণাংশুর ইচ্ছার এত বড় প্রতিবাদ আর হইতে পারিত না,—অন্ততঃ তিন পদের মাছ এবং এক পদের মাংস রান্না হইয়াছে। অর্থাৎ স্বামী প্রস্তরানন্দের কোনো উপদেশই তাকে মানিয়া চলিতে দিবে না এরা সব।

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভাবে অরুণাংশু মাকে বলিল, এ কী?

মা বলিলেন, কি আবার!

মাছ?

মাছ তাতে কি। যা যা, ফাজ্লামী করিস না। মাছ খাবিনে,—বিধবা নাকি তুই।

আলু সেদ্ধ আছে?

না নেই,—মোটেই নেই। মাছ না খেয়ে ওঠ দেখি তুই। কেন কি হয়েছে তোর—চোখ দুটো নষ্ট করবার বুঝি ইচ্ছে হয়েছে।

হায় নারী,—জানে না প্রস্তরানন্দ কি উপদেশ দিয়াছেন। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিতে নিরামিষ যে কতটা উপকারী তাহার বিশদ ব্যাখ্যা 'মানবের শত্রু নারী'তে আছে, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও আমিষ ছাড়া দরকার। কিন্তু মা'রা কি অত শত বোঝে,—তা হইলে আর ভাবনা ছিল কি। রাগিয়া, প্রতিবাদ করিয়া অরুণাংশুকে অবশেষে নিরুপায় ভাবে সেদিনের জন্য মাছই খাইতে হইল। কিন্তু আণ্ডার প্রটেষ্ট খাইল,—এবং বারবার করিয়া শুনাইয়া দিল যে ভবিষ্যতে নিরামিষের ব্যবস্থা না হইলে আর খাইবেই না সে। যতই স্বামী প্রস্তরানন্দের উপদেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে ততই যত রাজ্যের বিঘ্ন আসিয়া জড়ো হইতেছে!

সেটা বিষ্যুৎবার ছিল কি না জানা নাই, কিন্তু যত অপ্রিয় কিছু আজ অরুণাংশুর ভাগ্যে জুটিতে লাগিল। বিকাল বেলায় যে-কাণ্ডটা ঘটিল সেটাই সবার চাইতে সাঙ্ঘাতিক,—তাতে অরুণাংশুর চটিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ব্যাপারটা দশজনের কাছে সামান্য হইতে পারে, কিন্তু অরুণাংশুর কাছে মোটেই তা নয়।

বিকালবেলা পার্ব্বতী দেবী রেণুকার চুল বাঁধিয়া দিতেছেন। পাশে অরুণাংশু বসিয়া ডঙ্‌এর বইটা খুলিয়া ছবি দেখিতেছে, আর মাঝে মাঝে ছোট টেবিলটার উপর হইতে টেপ্‌টা উঠাইয়া লইয়া শরীরের কোন না কোন জায়গার মাপ নিতেছে। অরুণাংশুর কাণ্ডকারখানায় সবাই কৌতুক অনুভব করে,—ওর মা পর্য্যন্ত।

কিন্তু রেণুকা হাসি চাপিতে পারে না,—যতই বন্ধ করিতে চেষ্টা করে ততই বজ্‌ বজ্‌ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

অরুণাংশু কহিল, কি হয়েছে, হাসিস কেন? বেঞ্চে দাঁড়া করে রেখেছিল বুঝি ইস্কুলে?

রেণু বলিল, হুঁ, তা বৈকি!

তবে আর হাস্‌চিস কেন?

তোমার পড়া দেখে,—নইলে আর হাসব কেন। সণ্ডপুরাণ নাকি ওটা দাদা?

অরুণাংশু মায়ের কাছে নালিস করিয়া কহিল, তোমার মেয়েকে সাবধান ক'রে দাও,—নইলে ওর ফাজলামী বের করব কিন্তু।

মা শুধুমাত্র হাসিলেন। অরুণাংশু কহিল, কি শাসন করবেনা তুমি আহ্লাদে মেয়েকে। তবে আমিই—। রেণুকার চুল বাঁধা তখন শেষ

হইয়াছে। বেণী দুলাইয়া সে এমনি মরি-বাঁচি করিয়া ছুটিল যেন আর একটু হইলে সে গিয়াছিল আর কি! অরুণাংশু চেঁচাইয়া কহিল, দাঁড়া তোদের মাষ্টারণীকে চিঠি লিখতে হবে।

ঠিক এর পরেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মা যে কথা কহিলেন তাহা শুনিয়া অরুণাংশু তো প্রথমটায় একেবারে নির্ব্বাক্। এই প্রশ্ন সনাতন কাল হইতে সকল মা তার যুবক পুত্রকে করিয়া আসিতেছে। কহিলেন পাগ্‌লামীগুলো রেখে এইবার বিয়েটিয়ে করতো। গায়ের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিছা ছাড়িয়া দেওয়া হইল!

কথা ফুটিলে অরুণাংশু স-আতঙ্কে কহিল, কে?

মা কহিলেন, কে আবার, তুই। কথার একবার ছিরি দেখো।

অরুণাংশু কথার আর জবাব দিল না। সরোষে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া খর-দৃষ্টিতে একবার মাত্র চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কথা শোন একবার,—সখটা দেখ! তার প্রায় চীৎকার করিয়া ধমকাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে!

ছুটিয়া সে নিজের ঘরে গেল। টেবিলের উপরই 'মানবের শত্রু নারী' খোলা পড়িয়া আছে। বইটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কয়টা পাতা উল্টাইয়া সে একটা জায়গা বাহির করিল। সেখানে এই লেখাটী দাগ দেওয়া আছে,—'—অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই চিরকুমার থাকা উচিত। বিবাহিত ব্যক্তির শুধু ইহকালই নষ্ট হইল না, তার পরকালও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া রহিল। স্ত্রীলোককে সর্প-সম পরি—'দৃঢ়তার সাথে সে জায়গাটা ধরিয়া বইটা লইয়া মার কাছে ফিরিয়া গেল। সে-জায়গাটি আগাইয়া দিয়া কহিল, পড়।

মা সে স্থানটায় চোখ বুলাইলেন কিন্তু প্রবুদ্ধ হইলেন না। কহিলেন, চুলোয় দে বই, চুলোয় দে। এই কথায় অরুণাংশু ভারী আহত হইল। কী অপূর্ব্ব বই,—তার প্রতি মায়ের এ কী অবিচার। ক্ষণকাল সে আহত-দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ রাগান্বিত ভাবে গট্‌গট করিয়া হাঁটিয়া পর্দ্দাটা সজোরে ঠেলিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু এখানেই চরম সর্ব্বনাশ।

শয়তানের কাণ্ডকারখানা নয়ত কি, এমন সময় সুজাতা সেই ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল। হুড়মুড় করিয়া অরুণাংশু গিয়া তার উপর পড়িল। সুজাতা ছিটকাইয়া গিয়া ও-ধারের দেওয়ালের সাথে খাইল মৃদু ধাক্কা। দেখিয়া তো অরুণাংশুর চোখ প্রায় কপালে উঠিয়াছে। অবস্থা তার সত্য সত্যই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। সে না পারে পালাইতে, না পারে কোন কথা জিজ্ঞাস করিতে। কী যে করিবে সে ভাবিয়াই পাইতেছে না। হাত কচ্‌লাইল সুজাতাকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিল, না পারিয়া অধৈর্য্য হইল, একবার আগাইল ও একবার পিছাইল। অনেক চেষ্টায় যখন খানিকটা সাহস সংগ্রহ করা হইয়াছে তখন কহিয়া বসিল, আপনার লেগেছে নাকি ?

সুজাতার বিশেষ কিছু লাগে নাই,—বরঞ্চ অরুণাংশুর বিব্রত ভাব দেখিয়া তার পেট ফুঁড়িয়া অজস্র হাসি বাহির হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তা সে স্বীকার করিবে কেন ? মুখ কৃত্রিম-গম্ভীর করিয়া সে কহিল বেশ, এত জোরে ধাক্কা দিলেন, আর বল্‌ছেন লেগেছে কিনা। আমি কি পাথর নাকি !

অরুণাংশু কহিল, ওঃ। আমি কিন্তু—

তা বটে, কিন্তু মাথাটা তো আমার ফাটিয়ে দিলেন। রক্ত বেরুচ্চে নাকি ?

আমি গিয়ে আপনার,—কথাটা সমাপ্ত করিতে না পারিয়াই অরুণাংশু অত্যন্ত সহসা সড়াক করিয়া সরিয়া পড়িল। এইরকম কাপুরুষতায় তার নিজেরই লজ্জা হইল, কিন্তু উপায় কি। নারীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিবে ? আর শুধু কি কথা কাটাকাটি, মেয়েটা যে মিটমিট হাসিতেছে তার কি করা যায়! এই রকম অবস্থায় স্বামী প্রস্তরানন্দ স্ত্রী-সংসর্গ সর্পবৎ পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। নিজের ঘরে ঢুকিয়া তবে অরুণাংশু হাঁপ ছাড়িল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নাই। ডান হাতের তর্জ্জনীটা নাকের তলায় জানিনা কোন প্রয়োজনে গিয়াছিল। অকস্মাৎ একটা সুগন্ধ পাইয়া অরুণাংশু চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে,—খানিকটা তেলের ছাপ। সর্ব্বনাশের আর বাকী নাই। সুজাতার মাথার চুল হইতেই যে এ গন্ধতেল লাগিয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন কী করা যায়। আর দেরী নয়,—তোয়ালা টানিয়া এমনি জোরে সে জায়গা রগড়াইতে সুরু করিল যে চামড়া পর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিবার জোগাড়। তারপর ? তারপর কি করা যায়! তাড়াতাড়ি 'মানবের শত্রু নারী' খুলিয়া পড়িল—এমন কি নারীর ছায়া গায়ে পড়িলেও স্নান করিয়া ফেলা উচিত।

আর কাল বিলম্ব নয়! সাবান, কাপড় তোয়ালা প্রভৃতি লইয়া অরুণাংশু স্নানের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। পরক্ষণে গায়ের জামা কাপড় লইয়াই সে কল খুলিয়া দিয়া তার তলায় সটান্ বসিয়া পড়িয়াছে।



চার

সুজাতা এবং অরুণাংশুদের বাড়ি একই রাস্তায় অতি কাছাকাছি। অনুক্ষণ দু-বাড়ির মেয়েদের যাতায়াত চলে। তার ফলে এই হয় যে অরুণাংশুকে সাবধান হইয়া নিজেদের বাড়িতেই চলাফেরা করিতে হয়। কারণ সুজাতার কি সময়-ক্ষণ জ্ঞান আছে নাকি। যখন তখন তাদের বাড়িতে আসিয়া বসিয়া থাকে। কি রেণুকার সঙ্গে, কি তার মায়ের সঙ্গে সুজাতার কথা জমিতে কিছুমাত্র দেরী হয় না।

অরুণাংশুদের বাড়িতে সেদিন সন্ধ্যায় সুজাতাদের সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। পার্ব্বতী দেবী দুপুর হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাঁধুনী ঠাকুরের কাছে সমানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লোকটাকে আর অখাদ্য রাঁধিতে দিলেন না। রেণুকা না-বলা আনন্দে টগ বগ করিতে লাগিল,—কাউকে খাওয়াইতে পারিলে আনন্দিত হওয়া মেয়েদের স্বভাব। অথচ একই কারণে অরুণাংশু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সে ঠিক করিয়া গেল রাত্রি দশটার আগে সে আজ বাড়ি ফিরিবে না। গণ্ডগোল সব মিটিয়া গেলে আসাই সব চাইতে নিরাপদ!

বাহির হইবার সময় রেণুকা কহিল, আজ শীগ্‌গির বাড়ি ফিরো কিন্তু দাদা,—ওদের বাড়ির সবার আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ জানতো।

চটিয়া অরুণাংশু কহিল, নিমন্ত্রণ তো আমার কি তাতে,—পাতা ফেলবার জন্য তুইতো আছিস্।

রেণুকা কহিল, বাপরে!

অরুণাংশু কহিল, মাকে বলে দিস্, দশটার আগে ফিরবো না আমি। সাড়ে দশটাও হ'তে পারে।

রেণুকা কহিল, আজ রাতে খাবে, না খাবে না বল্‌বো।

হাতের আয়ত্তের মধ্যে তার বেণীটা পাওয়া গেল। কাজে কাজেই যা স্বাভাবিক তাই হইল, এবং রেণুকাও যতটুকু ব্যথা পাইয়াছে তার অনুপাতে চারগুণ চীৎকার করিল। কম চুল টানা সে অরুণাংশুর কাছে খায় না। কিন্তু তবু তার পরিহাস করার অভ্যাস গেল না।

সন্ধ্যার পরেই সুজাতা, ওর বাবা ও মা, এবং ভাই বাদল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। সুপ্রিয়া দেবী ও সুজাতাকে পার্ব্বতী দেবী আর রেণুকা আসিয়া ভিতরে লইয়া গেল। অরুণাংশুর বাবা নীরদবাবু, সুজাতার বাবাকে বৈঠকখানা ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। মাঝখান হইতে শুধু বাদল বাদ পড়িয়া গেল,—তার সমান বয়সের বাড়িতে কেহ নাই যে তাকে টানিয়া লইবে। তাছাড়া উৎসাহের আতিশয্যে বেচারীর কথা কারুর মনেই রহিল না। হয় কর্ত্তা নয়ত গিন্নী, যে কারুর সাথেই সে যাইতে পারিত, কিন্তু তাতে তার গর্ব্বে বাধিল। কাউকে অনুসরণ না করিয়া সে এক তলার ঢাকা বারান্দায় দুইটা সাম্‌না সাম্‌নি চেয়ার টানিয়া, একটাতে পা ছড়াইয়া ও অন্যটাতে বসিয়া চোখ বুজিল। আর মমতাময়ী ঘুম,—তার বাদলের উপর দরদ অত্যন্ত বেশী!

দুই বাড়ির দু-কর্ত্তা দুজনেই সমান মোটা। যখন তাদের ভুঁড়িতে

প্রায় ঠেকাঠেকি তখনও তারা পরস্পরের কাছে হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আছে। বৈঠকখানায় বসিয়া তারা তখন আলবোলা টানিতেছে। নীরদবাবু খবরের কাগজ পড়িয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া নিজের ভাষ্য ও মন্তব্য ব্যক্ত করিতেছেন। ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক! মোহনবাগান এক গোরা দলের কাছে হারিয়া গিয়াছে। নীরদবাবু কহিতেছেন যে এর কারণ শুধু এই যে বাঙালীরা কেবল ডাল আর ভাত খায়,—মাংস না খাইলে আবার ফুটবল খেলা যায় নাকি। মাংস না খাইলে এমনি করিয়া চিরকাল ভারতবাসী মাংসাশী সাহেবদের অধীনে থাকিবে। ভারতবর্ষের মুক্তির উপায় মাংসাহার! মাংস খাই না বলিয়াই তো আমরা এত রোগা হই!

সুজাতার বাবা আলবোলা টানিতেছিলেন। শেষের কথাটা শুনিয়া একবার বক্তার প্রকাণ্ড দেহের দিকে ও একবার নিজের ভুঁড়ির দিকে চাহিলেন, তারপর শুধু একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিলেন। কিন্তু নীরদবাবু এসব লক্ষ্য করেন নাই,—তিনি বাঙালীর কৃশতা সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

ভিতরে মেয়ে-মহলে তখন অত্যন্ত দ্রুতবেগে জিহ্বাগুলি চলিতেছে, এবং যে-সব প্রসঙ্গ ও যে সব লজিক আলোচিত হইতেছে, তার সম্বন্ধেই না বলাই ভাল।

কর্ত্তাদের খাওয়া হইয়া গেল। রাতারাতি বাঙালী জাতির উন্নতি করিবার জন্য যে পরিমাণ মাংস পরিবেশন করা হইয়াছিল তার সবটা যদি খাওয়া হইত তবে পরজন্মে নিশ্চয়ই দুটি হৃষ্ট শিশুর জন্ম হইত, কিন্তু তাতে এদের যে খুব উৎসাহ দেখা গেল তা নয়। খাওয়া-শেষে

বৈঠকখানায় ফিরিয়া গিয়া পান খাইয়া তামাক টানিয়া সুজাতার বাবা প্রসন্নবাবু কহিলেন, তবে উঠি দাদা, রাত করতে ডাক্তারের বারণ।

বৈঠকখানার বড় ঘড়িতে তখন কম রাত বাজে নাই,—সাড়ে আটটা বাজিয়া কোন্ দু-মিনিট বেশী না হইবে!

নীরদবাবু কহিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, শরীর সবার আগে। ডিস্-পেপ্সিয়াতে তোমার শরীরের কি আর কিছু আছে।

প্রসন্নবাবুর কলেবরখানা যদিও মোটেই এ-কথার সাক্ষ্য দেয় না, তবুও তিনি অত্যন্ত দুঃখিতের মতন মাথা নাড়িলেন। তারপর পান চিবাইতে চিবাইতে বিদায় নিয়া নীচ তলায় নামিয়া আসিলেন।

নীচের ঢাকা বারান্দাটায় আসিয়া পাশে নজর করিতে প্রসন্নবাবু দেখিলেন, দুটো চেয়ার জড়ো করিয়া বাদল আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে। কাছে গিয়া তাকে তিনি ঠেলাঠেলি করিয়া জাগাইলেন। কহিলেন, চল্ বাড়ি চল্, জায়গা মতো গিয়ে ঘুমুবি।

বাদল চোখ রগড়াইতেছিল, বিস্মিত হইয়া সে কহিল, আমি?

বাবা কহিল, হ্যাঁ তুই—তুই না কে? না না তোকে থাকৃতে হবেনা, তোর মা আর দিদির যেতে দেরী আছে।

বাদল আপত্তি করিল, কিন্তু আমি যে—

তাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়াই বাপ ধম্কাইয়া উঠিলেন, ঘুমুলে আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না। চল্ চল্ দেরী করিস নি।

বাদল স্তম্ভিত। বাবা বলিতেছে কি! নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে, না খাইয়াই যাইবে নাকি! আরে,—এ যে মহামুস্কিল,—বাবা একেবারে না-ছোড়বান্দা। বাদল কহিয়া উঠিল, বাঃ রে, আমি যে এখন পর্য্যন্ত—

প্রসন্নবাবু এবার সত্যই রাগিয়া উঠিলেন। বড় জ্বালাতন করে ঘুমাইলে এ ছেলেটা। শুধু শুধু এখানে পড়িয়া ঘুমানোয় কোন্ লাভটা! চটিয়া কহিলেন, 'ফের কথা বল্‌ছে,—আয় উঠে আয়—' অনিচ্ছুক বাদলের হাত ধরিয়া তিনি ওকে জোর করিয়া হন্‌হন্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

গেটের সম্মুখে অরুণাংশুর সাথে দেখা। অরুণাংশু বাহির হইবার সময় দশটার আগে ফিরিবেই না বলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দশটা বাজিতে যে এত দেরী হয় তা কে জানিত। একই রাস্তায় তিন-চার বার করিয়া হাঁটিল সে, তবু আটটাই বাজে না,—এমনি বড় সহর! একই রাস্তায় আর বেশীবার ঘুরিতে তার ভরসা হইল না। নিতান্ত চোর না মনে করুক, পুলিশের টিকটিকি সন্দেহ করা বিচিত্র নয়। সেটা আর যাই হোক, খুব গৌরবজনক মনে হইল না। অগত্যা আর কি করা যায়। মিউনিসিপ্যালটির পুকুরটার পারে গিয়াই সে দাঁড়াইয়া রহিল জলের দিকে চাহিয়া। তবে সেটা মোটেই কবিত্ব করিবার জন্য নয়,—সময় কাটাইবার জন্য। কিন্তু তাই বা আর কতক্ষণ পারা যায়। পাশ দিয়া চলিতে চলিতে দু-একটা লোক তার দিকে এমনি করিয়া তাকাইল যে অরুণাংশুর মনে হইল তারা সন্দেহ করিতেছে যে জলে ঝাঁপাইয়া সে হয়ত আত্মহত্যা করিয়া বসিবে। নিরুপায় হইয়া সে বাড়ি ফিরাই ঠিক করিল। চুপ চুপ করিয়া উঠিয়া গিয়া একবার তার নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে পারিলে আর কে পায় তাকে! কিন্তু বাড়ির গেটে প্রবেশ করিতেই প্রসন্নবাবুর সাথে দেখা হইয়া গেল। অরুণাংশু প্রথমটা চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে যখন মেয়েরা নাই দেখিল তখন আশ্বাস পাইল।

ছাড়বেন না।

মানবের শত্রু নারী

ওকে দেখিয়া প্রসন্নবাবু কহিলেন, অরুণ নাকি ?

হ্যাঁ।

বেরিয়ে ফিরছ বুঝি ? কোথায় গিছলে ?

নানান্ জায়গায়।

তাই দেখ্‌তে পাইনি। আমাকে শেষ না করে আর তোমার বাবা ছাড়বেন না,—এক হপ্তার খাওয়া খাইয়ে দিয়েছেন।

অরুণাংশু কহিল, ওঃ।

সামাজিক কথাবার্ত্তা কেমন ভাবে বলিতে হয় সে-সম্বন্ধে ওর জ্ঞান এতই সামান্য যে হুঁস থাকিলে ও নিজেই লজ্জিত হইত। যখন প্রসন্নবাবু বলিলেন যে অরুণাংশুর বাবা তাকে সপ্তাহের খাওয়া খাওয়াইয়া দিয়াছেন, তখন আহারের পরিমাণ আর খাদ্যের আয়োজন না জানিয়াও তার বলা উচিত ছিল,—'না না, এমন আর কি'। কিন্তু সে বিদ্যা কি অরুণাংশুর আছে নাকি! প্রতিবাদের কথা সে কল্পনাই করিল না, কহিল, ওঃ!

প্রসন্নবাবু কহিলেন, আচ্ছা আসি, বিস্তর রাত হ'য়ে গেল!

অরুণাংশু কহিল, আচ্ছা।

ওরা চলিতে সুরু করিল। কি কারণে বলা যায় না, অরুণাংশুর মনে সহসা সামাজিকতা চাড়া দিয়া উঠিল। বাদলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাদলের পেট ভরেচে তো ?

মুখ-অন্ধকার করিয়া চলিতে চলিতেই বাদল কহিল, হুঁ।

ব্যস্!

ভাগ্যিস্ সবাই তার বাবার মত নয়, তাইশেষে বাদল সত্যিই আর

বাদ পড়িল না। অন্যান্য সবার আহারের জোগাড় করিবার সময় পার্ব্বতী দেবীর ওর কথা মনে হইল। বাদলকে সে-রাত্রের জন্য আর উপোস করিতে হইল না। রাত্রে ওর ঘুম ভালোই আসিয়াছিল।

এদের বিদায় দিয়া অরুণাংশু নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল! শুক্লাচতুর্থীর খণ্ড-চাঁদ তখন পলাশ ও কৃষ্ণচূড়া বনের আড়ালে বিলুপ্ত হইবার জোগাড় হইয়াছে। ক্ষীণকায় চাঁদের পাণ্ডুর জোৎস্না সিঁড়িতে, জানলার কপাটে, বারান্দার এখানে ও-খানে আসিয়া অবিচারে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে।

বেশ একটু আশঙ্কিত ভাবে অরুণাংশু এদিকের বারান্দা পার হইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল। তার ঘরের সম্মুখের বারান্দাটা অন্ধকার,—দেওয়াল দিয়া জ্যোৎস্নার পথ আটকান। তাতে অরুণাংশুর যে কোন বিশেষ আক্ষেপ আছে তা নয়। বরঞ্চ অনেক সময় জমাট্ অন্ধকারেই তার বেশী ভাল লাগে। অন্ধকারের মধ্যে একটা সাধনার রূপ আছে! বিশেষ 'মানবের শত্রু নারী'তে লেখা আছে যে,—যাক্!

নিজের ঘরের কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া অরুণাংশু দেখে বারান্দার রেলিঙে ভর করিয়া বাহিরের দিকে রেণুকা তাকাইয়া আছে। ওর মুখ এখান হইতে দেখা যায় না,—মনে হয় এক ছায়া-মূর্ত্তি। কোথা হইতে এক-খণ্ড জ্যোৎস্না শুধু মাত্র ওর মাথায় আর খোঁপায় আসিয়া পড়িয়াছিল। রেণু যে ওর আগমনের কথা টের পায় নাই, তাতে অরুণাংশুর সন্দেহ রহিল না। সাথে সাথেই ওর মনে দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারের মধ্যে ওকে চমকাইয়া দিলে কি সহজেই না একটা মজা হয়!

পা টিপিয়া খুব সাবধানে অরুণাংশু আগাইয়া গেল। ঠিক হইয়াছে,—এখনও ও টের পায় নাই।

অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া ওর খোঁপাটা টানিয়া দিয়া অরুণাংশু চীৎকার করিয়া উঠিল, বাপ্‌রে, ভূত!

মেয়েটি চমকাইয়া ফিরিল বটে, কিন্তু তার চেহারা দেখিয়া অরুণাংশু তো বজ্রাহত। একটা আস্ত ভূত দেখিলেও সে এর বেশী শিহরিয়া উঠিত না। এ মোটেই রেণুকা নয়,—তার আশে পাশেও না,—এ,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সুজাতা। সর্ব্বনাশ নয়ত কি,—অরুণাংশু চোখ বুজিয়া একদম ছুট্ দিবে নাকি। মন্ত্র দিয়া কেউ তাকে অদৃশ্য করিয়া দিতে পারে না! আরে ছাই, কি করিবে সে!

তাড়াতাড়ি এখন কিছু একটা না বলিলে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে এ বুদ্ধিটা তার ছিল,—'মানবের শত্রু নারী' তার অন্তত অতটুকু বিচার বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু ভাষাই যে খুঁজিয়া পায় না।

কহিল, দেখুন, ইচ্ছে করে আমি আর,—আমি ভাব্‌লাম,—অন্ধকার কিনা—

সুজাতা কহিল, হুঁ।

অরুণাংশু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়া কহিতে উদ্যত হইল, দেখুন আমি—

ওর বিব্রত শঙ্কা-ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া সুজাতার বেদম হাসি পাইতে-ছিল। রেণুকা ভাবিয়াই যে অরুণাংশু তার খোঁপা টানিয়াছিল তা সে খুব বোঝে। আর ভুল করিলে অতটা লজ্জিত হইবার কোন্ ঠেকা। সে মোটেই কিছু মনে করে নাই,—কিন্তু 'মানবের শত্রু নারী'র একাগ্র

পাঠকটি এম্‌নি বিপদে পড়িবে, সেটা যে কী মজার কথা তার আর তুলনা নাই।

কিন্তু অমন একটা স্ত্রী-বিদ্রোহীকে সে ছাড়িবে নাকি। এ-সুযোগটার যদি পারা যায় সুব্যবহার করিয়া লইবে। 'দেখুন আমি—' বলিয়া অরুণাংশু আরম্ভ করিতেই সুজাতা তাকে অগ্রসর হইতে না দিয়াই কহিয়া উঠিল, ভুল করেছিলেন, এই তো ? কেমন, বলুন তো, তাই বলছিলেন না ?

আশ্বস্ত হইয়া অরুণাংশু কহিল, হ্যাঁ।

মুখে গম্ভীর ভাব টানিয়া আনিয়া সুজাতা কহিল, বাবাঃ, ভুল করেই যেমন মাথা ফাটাতে, চুল ছিঁড়তে সুরু করেছেন, ইচ্ছে করে করলে আর বেঁচে থাক্‌তে হ'তো না আমাকে।

অরুণাংশু কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বলিবার কিছু জোগাড় হইল না। এ অবস্থায় পালাইতে পারিলেই ভাল হয়, কিন্তু তার সুযোগও মিলিতেছে না। অন্তত পক্ষে কিছুক্ষণের জন্য একান্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া তার উপায়ান্তর নাই। এমন হইবে জানিলে অনায়াসে সে পুকুরপাড়ে আরও দু-ঘণ্টা কাটাইয়া আসিতে পারিত। কিন্তু কি আর করা যাইবে,—কথায় আছে, ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র !

সহসা সুজাতা কহিয়া উঠিল, অরুণ দা ?

অরুণ দা ? অরুণাংশু গুরুতর শাস্তির জন্যও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এর জন্য নয়। কান তার ঠিক আছে তো ?

সুজাতা কহিল, আপনি এতো মুখ-চোরা কেন, অরুণ দা ? আমাকে দেখে আপনি খুব লজ্জা পান্ বুঝি ?

মানবের শত্রু নারী

অরুণাংশু কহিল, আমি ?

সুজাতা হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আপনি নয়ত কে আবার ! এর পর থেকে আর লজ্জা করে' দরকার নেই,—বুঝ্‌লেন তো ?

জবাব দিবার মত ক্ষমতা অরুণাংশুর অবশিষ্ট ছিল না। কখন যে সুজাতা চলিয়া গেল, তাও তার খেয়াল হইল না। চমক ভাঙিলে তাড়াতাড়ি সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এতক্ষণে তার পৌরুষ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। লজ্জা করিবে সে নারীকে ?—আস্পর্দ্ধার কথা শোন একবার ! মহা আহাম্মুক সে,—এর একটা কড়া জবাবও দিতে পারিল না। লজ্জা না আরো কিছু,—কিন্তু তাই বলিয়া নারীকে প্রশ্রয় দিবে বুঝি ! নাঃ,—'মানবের শত্রু নারী' না খুলিলে আর চলিতেছে না।

বিজ্‌লী আলোর সুইচ টিপিয়া সে 'মানবের শত্রু'র সন্ধানে গেল। টেবিলটার উপরে তার যথাস্থানে সেটা সগর্ব্বে পড়িয়া আছে। কিন্তু বইটা তুলিয়া লইতেই,—এ কী সর্ব্বনাশ ! বইটার উপরে 'মানবের শত্রু নারী'র 'শত্রু' কাটিয়া কে যেন কালি দিয়া বড় বড় হরফে লিখিয়া রাখিয়াছে 'বন্ধু'। অরুণাংশু প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে তার মধ্যে অকস্মাৎ একটা হিংস্র কল্পনা জাগিয়া উঠিল,—লক্ষ্মীছাড়ী রেণুকার বেণীটার নাগাল যদি পাওয়া যাইত তবে তার একটা চুলও বাকী রাখিত না অরুণাংশু। তার ইচ্ছা হইতেছিল, চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ জানায়। শুধুমাত্র বাড়িতে এতগুলি লোক বলিয়াই দক্ষ-যজ্ঞ একটা আর সে বাঁধাইতে পারিল না। মনের ক্ষোভে গজগজ করিতে লাগিল।

পাঁচ

এর ঠিক পরের দিনের কথা। দুপুর বেলায় অরুণাংশু জোর করিয়া ঘুম ঠেকাইয়া রাখিতেছিল। দিবা-নিদ্রা নানান্ দিক হইতেই অন্যায়,—এমন কি স্বামী প্রস্তরানন্দের বইয়েও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নিদ্রার প্রকোপ এড়ানও সহজ কথা নয়। বই পড়া এখন সম্পূর্ণ বোকামী,—ছাপার অক্ষর চোখের সমুখে উঠাইয়া ধরিলে ঘুম ঠেকানোর মত জোর অন্তত পক্ষে তার নাই।

মায়ের ঘরে নিশ্চয়ই কেউ আসিয়াছে,—কথাবার্ত্তা শোনা যাইতেছে কতক্ষণ হইল। নইলে ওখানে যাওয়া চলিতে পারিত। ভাবিয়া চিন্তিয়া অরুণাংশু ঠিক করিল যে এই অনিষ্টকারী ঘুমের একমাত্র প্রতিকার রৌদ্রে ঘুরিয়া আসা। সাথে সাথে তার মনে পড়িল ডাকে দিবার দুইটা চিঠি আছে। ব্যস্, আর কথা কি। এই দুপুর রোদে ঘুরিবার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল।

জামা গায় দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। নীচের বসিবার ঘরের কাছাকাছি আসিয়া সে শুনিল খুব কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। একটু মাত্র দাঁড়াইয়া শুনিয়া ওর আর সন্দেহ রহিল না,—গলাটা আর কারুর নয়, নিশ্চয়ই সুজাতা কথা কহিতেছে। রেণুকা যখন বাড়ি নাই, ইস্কুলে গেছে, তখন মা ছাড়া আর কার সাথে সে কথা কহিবে! কি অজস্র

বকিতে পারে রে মেয়েটা,—কথার আর বিরাম নাই। অত কথা খুঁজিয়া পায় কি করিয়া তাহাই অরুণাংশু ভাবিয়া পায় না।

বেশ স্পষ্ট করিয়া শোনা গেল,—কী যে বলেন মাসীমা, বুড়ী হয়েছেন না ছাই। হ্যাঁ, সারা মাথায় পাকা চুল বৈকি! একটা খুঁজে বের করতে আমার কী মেহান্নতটাই যে হচ্ছে তা টের পান না কিনা! কলেজের গল্প বল্‌বো? কি আর গল্প বলবার আছে। পড়া, ক্লাস যাওয়া, খাওয়া আর গল্প। রেণু যদি পরের বার যায় তো দু-জনে আমরা একটা ঘরে থাক্‌বো। এতগুলো মেয়ের দৌরাত্ম্যে ঘর গুছিয়ে রাখা কী যে দায় তা আমিই জানি।

অকারণেই সুজাতা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অরুণাংশুর আর সহ্য হইল না। তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মেয়েগুলিকে সে দেখিতে পারে না। হো-হো করিয়া সব সময় যেন হাসিলেই হইল। সারা সময়েই ওর এ বাড়িতে আসিয়া বসিয়া থাকিবারই বা কী দরকার। মাকে একলা পাইলে আর এই রৌদ্রে তাকে বাহির হইতে হইত না। কিন্তু এখন রৌদ্রে খানিকটা টো-টো করিয়া আসা ছাড়া ঘুম তাড়াইবার আর কোন মাত্র উপায় নাই।

অসন্তুষ্টভাবে অরুণাংশু পোষ্টাপিসের দিকে চলিল। তা, গায়ে রৌদ্র লাগান ভাল,—তাতে আল্‌ট্রা ভায়োলেট্‌ রশ্মি আছে। হাড় মোটা হওয়ার কথা!

পোষ্টাপিসের কাজ শীগগিরই মিটিয়া গেল। তারপর আরো কিছুকাল আল্‌ট্রা ভায়োলেট রশ্মি লাগাইয়া মোটা হইবার ব্যবস্থা করিয়া অরুণাংশু বাড়ি ফিরিল। ঘুমের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নাই। যা

ছিল সব বাষ্প হইয়া কপাল ও গা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। এবং নাকে ও মুখে এতটা রাস্তার ধূলা ঢুকিয়াছে যে জড়ো করিলে তাহা দিয়া একটা দালান তৈরী করা যাইত।

মায়ের ঘরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল এতক্ষণে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুজাতাও নাই।

ঘরে ঢুকিয়া আল্‌নার উদ্দেশ্যে স্যাণ্ডাল জোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অরুণাংশু গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। কম কথা নয়, এই রৌদ্রের মধ্যে শুধু মাথায় অতটা ঘুরিয়া আসা খুব একটা সহজ ব্যাপার না। ঘরের মধ্যটা কী চমৎকার ঠাণ্ডা,—তা নাইবা থাকিল আল্‌ট্রা ভায়োলেট। এইবার মহা আয়াসে চেয়ারে বসিয়া—, কিন্তু ও-দিকে চোখ ফিরাইতেই সমস্ত আরাম চট্ করিয়া অন্তর্হিত হইল। কী ভয়ানক কথা,—অরুণাংশুর টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শ্রীমতী সুজাতা কোন্ একটা বই পড়িতেছিল, শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া চাহিল। এর চাইতে যদি একটা সাপকোপও থাকিত, তাও শতগুণে ভালো ছিল! কিম্বা যদি জীবন্ত সিংহী হইত তাতেও আপত্তি ছিল না।

সুজাতা যেন একটুক্‌রা খুসীর মত। অকারণ আনন্দে টগবগ করে। তার মধ্যে না আছে অপ্রতিভতার চিহ্ন, না আছে কোনো দ্বিধা। অরুণাংশুকে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে চোখ উঠাইয়া একটু হাসিয়া কহিল, অরুণদা, আমি চোর!

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত কহিল, ওঃ।

সুজাতা কহিল, 'ওঃ',—সত্যি আমাকে চোর মনে করেন না কি? বেশ তো মজা,—অনায়াসে বল্লেন, ওঃ!

অরুণাংশুর সপ্রতিভতা খানিকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। স্বামী প্রস্তরানন্দের শিক্ষাও কিছু কিছু মনে পড়িল।

গম্ভীর হইয়া সে কহিল, তবে কি বল্‌ব?

সুজাতা কহিল, বল্‌বেন আবার কি,—কিছু বল্‌বেন না, শুধু হয়ত একটু হেসে দেবেন। মানুষকে অমন অপ্রতিভ করতে আছে নাকি।

অরুণাংশু উত্তর দিল না। মহা বিপদে পড়িয়াছে সে। তার ঘরের মধ্যে নারী প্রবেশ করিবে তা প্রায় অসহ্য ব্যাপার। কিন্তু কি করিয়া একে বলে, বেরিয়ে যাও। এই সঙ্কটের সময় শুধু মাত্র স্বামী প্রস্তরানন্দ উপদেশ দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তো টেবিলের উপরে,—যেটার উপরে নারী বসিয়া আছে। অরুণাংশুর রৌদ্রে হাঁটিয়া আসিয়া জল-তেষ্টা পাইয়াছে, জল খাইতেই চলিয়া যাইবে নাকি! এমন অবস্থায় সে যদি জলপান করিতে বাহির হইয়া যায় কেউ তার দোষ দিতে পারিবে না।

কিন্তু সুজাতা প্রশ্ন করিয়াই তাকে বিব্রত করিল। অন্তত পক্ষে এখন জল খাইতে গেলে কেউ তার তৃষ্ণার্ত্ততার কথা বুঝিবেনা, অরুণাংশুকে কাপুরুষতার অপবাদ দিবে। সেটা আর সহ্য করা যায় না।

সুজাতা একটা বই তুলিয়া অরুণাংশুকে কহিল, চমৎকার বই এটা আপনার। সেদিন ট্রেনে দেখেই আমার পড়বার লোভ হয়েছিল।

হায়, কার হাতে পড়িয়াছে 'মানবের শত্রু নারী'! এত দুর্ভোগও ছিল ওর কপালে! স্বামী প্রস্তরানন্দ হয়ত শুনিলেও শিহরিয়া উঠিবেন।

অরুণাংশু কহিল, ওটা স্ত্রী-পাঠ্য নয়।

সুজাতা কহিল, স্ত্রী-পাঠ্য বলে আলাদা বই আছে নাকি আবার। কোন্ শতাব্দী এটা,—ভুল হয়ে যাচ্চে আমার যেন।

কিন্তু—

মেয়েদের গালাগালি আমার খুব ভালো লাগবে। খুব হাসি পাবে পড়্তে। ক'টাকা দাম ওটার অরুণদা, আমি কিনবো একটা!

এখানে মোটেই পাওয়া যাবে না। সব জায়গায়ই কি এসব বই পাওয়া যায় নাকি?

তবে এইটেই আমি নিয়ে গেলুম।

সর্ব্বনাশ! কী বলিতেছে মেয়েটা! 'মানবের শত্রু নারী'কে কোন মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে সে! এতটা জ্ঞানের কি সম্মান থাকিবে তবে, বইটার দুর্গতির কি তবে আর বাকী থাকিবে কিছু!

অরুণাংশু কহিল, না না ওটা দিতে পারব না। সুজাতা কহিল, বাস্‌রে, কী কিপটে আপনি। খেয়ে ফেলবো নাকি আমি বইটাকে, —যা বিশ্রী দেখতে কাগজগুলি।

অরুণাংশু চুপ করিয়া গেল। একে নিয়া মহা দায় হইয়াছে, —যা খুসী সে অপবাদই দিয়া বসে।

সুজাতা টেবিল হইতে নামিয়া পড়িয়া বইটা তুলিয়া লইয়া কহিল, এই আমি নিয়ে গেলুম, এক ঘণ্টার মধ্যেই সারা হয়ে যাবে। ভয় নাই আপনার, বাড়ি নিয়ে যাবনা, মাসীমার ঘরে বসেই পড়ব।

তারপর ঘর হইতে হাসিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল,

ভাবনা নেই, কিছু চুরি করিনি। মাসীমা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে একটা বই জোগাড় করতে এসেছিলুম। শুধু শুধু বসে থাক্‌তে পারে নাকি কেউ।

গেল গেল, একান্ত প্রিয়জনকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উপায় কি। এক এক বার অরুণাংশুর মনে হইল ছুটিয়া গিয়া ওর কাছ হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া আসে। কিন্তু তা কি আর সম্ভবপর!

ঘণ্টা দেড়েক পরেই সুজাতা ফিরিয়া আসিল। অরুণাংশু টের পাইল, কিন্তু অকস্মাৎ তার মনোযোগ এমনি বাড়িয়া গেল যে আর বলার নয়। কিন্তু খেয়াল নেই যে যে-বইটা চোখের সমুখে মেলা, সেটা গভীর মনোযোগ দিবার মত নয়। টাইম-টেবল কে আর কবে চিন্তা করিয়া পড়িয়াছে। তা হইলে কি হয়, সুজাতাকে সে মোটেই দেখিতে পাইতেছে না,—অখণ্ড ওর মনোযোগ!

সুজাতা আগাইয়া আসিয়া কহিল, নিন্, হয়ে গেছে। ভারী মজার বই কিন্তু,—প্রহসন বুঝি?

অরুণাংশুর মনোনিবেশ অত্যন্ত গভীর! কিন্তু এই রকম কথা সহ্য করা প্রায় প্রাণান্তকর ব্যাপার। 'মানবের শত্রু নারী' প্রহসন! ধৃষ্টতারও একটা মাত্রা থাকা উচিত। কিন্তু কড়া জবাব দেওয়া শুধু মাত্র বাক্য ব্যয়। মেয়ে-মানুষ এর গভীর ফিলজফির কি বুঝিবে। ওদের বিদ্যা নাটক-নভেল অবধি!

অরুণাংশুর কোন জবাব না পাইয়া সুজাতা আরো কাছে আসিল। তারপর চাহিয়াই তো সে অবাক্। মনোনিবেশের ইতি-

হাসে টাইম টেবলের ওপর এতটা অখণ্ড মনোযোগ আর শোনা যায় নাই। সবিস্ময়ে সে কহিল, এ কী পড়ছেন, টাইম টেব্‌ল নাকি ?

এবার অরুণাংশু কহিল, হুঁ।

সুজাতা টেবিলের উপর 'মানবের শত্রু নারী'কে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, দেখুন না, অরুণদা, এখান থেকে পেশোয়ার অবধি যেতে কত ভাড়া ?

অরুণাংশু বিস্ময়ে চোখ উঁঠাইয়া কহিল, পেশোয়ার ?

টেবিলটার উপর আঙুল দিয়া খেলা করিতে করিতে সুজাতা কহিল, হুঁ, পেশোয়ার। নয়ত ধরুন রাওয়ালপিণ্ডি কিম্বা উটকামণ্ড !

কী হবে ?

হবে আবার কী। ওসব হিসেব করতে আপনার ভাল লাগেনা বুঝি ?

না।

না ? আশ্চর্য্য ! আমি তো অমনি কত দুপুরবেলা ভিজাগাপটম্‌ পণ্ডিচেরী অমৃতসর চলে যাই। কোনোদিন বা লক্ষ্ণৌ গিয়ে ঠুংরী শুনি। এমন কি হয়ত গজল্‌ শুন্‌তে পারসিয়াতেও চলে যেতুম, শুধু টাইম টেবল্‌-এ ওর ভাড়া খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই হাঙ্গামা। একটা সারা দুপুর আমি খাইবার পাস্‌-এ ঘুরে বেড়িয়েছিলুম।

উঃ, অরুণাংশু আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। একটা মেয়ে আসিয়া তার কাছে লেকচার দিবে এ আর সে প্রাণ ধরিয়া শুনিতে পারে না। আর প্রগল্‌ভতা দেখ,—খুব যেন ভাব জমাইয়া নিয়াছে! অথচ

বোঝে না কতটা রাগে অরুণাংশু গজগজ করিতেছে। 'মানবের শত্রু নারী'র উপদেশ সে ভোলে নাই। নারীকে প্রশ্রয় দিলে পরিণামে অনুতাপ করিয়া মরিতে হয়!

কিন্তু কী করিবে। তাড়াইয়া দিবে নাকি? দূর্—তাও কি পারা যায়! তার চাইতে,—উঃ, অরুণাংশুর কী যে জল-তৃষ্ণা পাইয়াছে তা আর বলিবার নয়। গলা শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইবার জোগাড়।

সুজাতা কহিল, যান কোথায়? লজ্জা পাচ্ছেন নাকি? তা হ'লে আমিই না হয় চলে যাই।

লজ্জা পাব কেন?

তবে?

সবটারই কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি? আমার ইচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি, এর ওপর আর কোনো কথা আছে?

যাক্, এতক্ষণে কড়া রকম একটা কথা সে বলিতে পারিল! ফাজলামির আর জায়গা পায় না! অরুণাংশু যেন একটা খেলার পাত্র!

বিজয়ীর মত গট্‌গট্ করিয়া হাঁটিয়া অরুণাংশু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পালাইয়াছে না আরো কিছু! তার বুঝি আর জল-তেষ্টা পায় নাই।

সুজাতা একটুক্ষণ চুপ করিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। চোখের চাউনি অকস্মাৎ একটু ম্লান হইয়া গেল। ওর উপর কেউ কোনো দিন রাগ করে না। সবাইকে হাসাইয়া, আনন্দ দিয়া ও টগবগ করিয়া চলে হঠাৎ যদি এম্‌নি কেউ একটু বিরক্তি দেখায় তবে তা বড় বাজে'। তা-

ছাড়া,—দূর ছাই,—ওর ভাল লাগিতেছে না ! রেণুর দাদা যে এমন তা আর কে জানিত !

বাহিরটা অস্পষ্ট দেখাইতেছে কেন ? চোখে কী আসিয়া জমিল। ছিঃ, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিতে হইবে,—কেউ যদি দেখিয়া ফেলে



ছন্ম

পূজা আসিয়া পড়িল। বাতাসে বাতাসে শানাই আর ঢোলের শব্দ ভাসিয়া আসে। বিস্তর নতুন জামা-কাপড় কেনা হয়। হাসি ওঠে, আনন্দ-চীৎকার শোনা যায়। অনেক ছাগ-শিশু আর্ত্তনাদ করিয়া মরে।

এর মধ্যে একদিন বিকাল বেলা অরুণাংশু বারোয়ারী পূজার প্রতিমা দেখিয়া আসিবে ভাবিয়া নীচে নামিল। অবশ্য স্বামী প্রস্তরানন্দ মা কালীকেই বেশী রকম শ্রদ্ধা করিয়াছে, তবু কিন্তু কাউকেই অশ্রদ্ধা দেখান ঠিক নয়।

নীচে মায়ের সাথে দেখা। তিনি কহিলেন, যাচ্ছিস্ কোথায়? খেয়ে যাবি না?

অরুণাংশু দেবীদর্শনে যাইতেছে। পথের মাঝে এ কী বাধা। দেবী দেখিতে যাইতেছে,—তার আবার ক্ষিধার কথা মনে থাকা উচিত নাকি!

সংক্ষেপে কহিল, ক্ষিধে নেই।

মা কহিলেন, বলিস্ কি রে। দুপুরেই তো ক্ষিধে পেয়েছে বলেছিলি।

আঃ জ্বালাতন করিল!

অরুণাংশু কহিল, মোটেই ক্ষিধে নেই,—কম খেয়েছিলুম নাকি দুপুরে ?

পার্ব্বতী দেবী কহিলেন, এই রে পাগলা ! কোথায় তাড়াতাড়ি যাবার ঠেকা পড়েছে, অমনি আর ক্ষিধে তেষ্টা জ্ঞান নেই। যাক্, আর কিছু না হোক্, এক কাপ দুধ খেয়ে যা। দুধ খাইয়া যাইবে ? তার চেয়ে খানিকটা আফিঙ্ গুলিয়া খাইতে হইলে ক্ষতি ছিল কি !

কহিল, দুধ !

হ্যাঁ।

দুধ কে খাবে ? আমি ? দুধ খাব, আমি বাছুর নাকি ?

যা যা, দুধ না খেলে আবার গায়ে জোর হয় কখনো,—দুধ খাবেন না।

প্রত্যুত্তরে অরুণাংশু পাঞ্জাবির হাতাটা গুটাইয়া হাতের মাংসপেশীটা ফুলাইয়া দেখাইয়া দিল।

মা কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে !

অরুণাংশু যদিও কিছুতেই দুধ খাইল না, কিন্তু মা'র হাতে যখন পড়িয়াছে তখন কিছু না খাইয়া আর উপায় কি। মা'রা তো আর সাইকোলজি বোঝে না, মন যখন ছুটিয়া চলিয়াছে তখন অবিচারে দেহটা আটকাইয়া ধরে। এই জন্যই তো স্বামী প্রস্তরানন্দ স্নেহের বাগুড়াও এড়াইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অরুণাংশুর যে ক্ষিধা নাই এমন মোটেই মনে হইল না। যে রকম ভাবে সে খাবারগুলির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল তাতে পার্ব্বতী দেবীর আর কোনো আক্ষেপই রহিল না। শুধু দুধটায় ওর বিতস্পৃহা,—এই যা !

মানবের শত্রু নারী

এই পর্য্যন্ত বেশ চলিতেছিল। খাবারগুলি সুস্বাদু, আর—যাক্ সে কথা। ঘটনাটা চমৎকার মিলের একটা কবিতার মত চলিতেছিল। কিন্তু অরুণাংশুর ভাগ্যে সুখ নাই,—কাকে আর দোষ দেওয়া যায়।

অকস্মাৎ মা কহিলেন, ওদের কিন্তু আমি কথা দিয়ে ফেলছি, অরুণ!

অরুণাংশুর চোখ দুটী বিস্ফারিত। এ আবার কী কথা, ওদেরই বা কাদের, এবং কথাই বা কী কথা। একটা গল্পের আগা জানা নেই শেষ জানা নেই, মাঝখান হইতে একটা বাক্য উঠাইয়া দিয়া তাবে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হইল,—এ প্রায় সেই রকমই। সে সবিস্ময়ে কহিল, কি?

প্রসন্নবাবুকে আমরা কথা দিচ্চি। সুজাতাকে আমরা বউ করে আনব।

বউ ক'রে আন্‌বে!

প্রথমটা অরুণাংশু বুঝিতেই পারিল না সুজাতাকে বউ করিয়া আনিবার প্রস্তাবের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক,—এমনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা ভাবিয়া তার তো চক্ষু স্থির!

মা কহিলেন, অনেক দিন ধরে ওরা অপেক্ষা করে আছেন,—এইবার একটা পাকাপাকি কথা না বল্‌লে চলবে না।

অরুণাংশু চাহিয়া কহিল, তোমরা কি করতে চাও! শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাকে?

মা কহিলেন, কথা শোন ছেলের।

মানবের শত্রু নারী

অরুণাংশুর আর বুঝিতে বাকী রহিল না ব্যাপারটা এত দিন ধরিয়া কি হইয়াছে। এবং প্রায় রোজই মা যে বিয়ের কথা বলিয়া তার হাড় জ্বালাইয়াছেন, তার লক্ষ্যটা কোথায়। সর্ব্বনাশের কথা বলে! বিবাহ করিবে সে? এতদিন স্বামী প্রস্তরানন্দ প্রণীত 'মানবের শত্রু নারী' পড়িয়াছে না? তবে!—তবে আর কি। নারী বিষধর সর্প, নারী নরকের দ্বার ও তাড়কা রাক্ষসীর সগোত্রা।

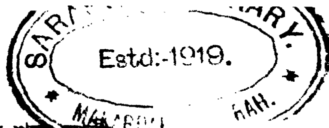
গম্ভীরস্বরে সে কহিল, ওসব মতলোব ছেড়ে দাও।

মা কহিলেন, পাগ্‌লামী করিস নে,—এ ঠাট্টার কথা নয়। ঐ পাশের ঐ জমিদার বাড়ি দেখিস না,—অল্প বয়স জমিদারের। সেই তো সুজাতাকে বিয়ে করতে চায়। আমরা কথা না দিলে হয়ত ওখানেও ওরা করতে পারে।

চটিয়া অরুণাংশু কহিল, করুক না, না করছে কে। বিয়ে? আমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

আর কথা নয়। নেহাৎ বীতশ্রদ্ধ হইয়া অরুণাংশু উঠিয়া গেল। ডাকুক গিয়া মা,—কে শোনে মেয়ে মানুষের কথা! পৃথিবীতে আর লোক নাই, বিয়ে করিবে সে। এতকাল তবে পড়িল কি। নিতান্ত যারা মূর্খ তারাই বিবাহ করিয়া মরে! এত জানিয়া শুনিয়াও অরুণাংশু বোকামী করিবে নাকি!

যখন বাহিরে আসিল তখন চারিদিকে ছায়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা হইবার আর দেরী নাই। রাস্তার পাশের গাছগুলিতে নীড়-ফেরা পাখীদের কলরব সুরু হইয়াছে। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক বক উড়িয়া গেল।



মানবের শত্রু নারী

অরুণাংশুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। প্রতিমা দেখিতে যাইবে সে কথা ও ভুলিয়াই গেল। সমুখের ছায়া-আঁকা পথটা দিয়া যাত্রা সুরু করিল। কোন উদ্দেশ্য নাই,—হাঁটিয়া হাঁটিয়া কোনখানে পৌঁছিলেই হইল। না পৌঁছিলেও কোন আপত্তি নাই।

প্রসন্নবাবুর বাড়ির কাছে পৌঁছিলেই অরুণাংশু শুনিতে পাইল উপরতলা হইতে একটা গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। কার গান তা অরুণাংশুরও বুঝিয়া নিতে বিলম্ব হয় না। ঐ দিকের নারকেল-বনে এক টুকরা চাঁদ উঁকি দিতেছে। কৃষ্ণচূড়াগাছের পাতাগুলি ঝিলমিল করে। সুজাতার গানের পদগুলি স্পষ্ট হইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন পথের ধারের সবুজ ঘাসে আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। এ সব আর অরুণাংশু সহ্য করিতে পারে না,—অত্যন্ত বিরাগজনক কাণ্ডকারখানা!

ডবল জোরে পা ফেলিয়া অরুণাংশু বাড়িটা পার হইয়া আসিল।

তারপরই সেই জমিদার-বাড়ি। কোথাকার জমিদার, কতটা জমির, এবং আয় কত সে সব অরুণাংশু কিছুই জানে না। তবে জমিদার-ছোক্‌রার মুখ সে চেনে। বৎসরখানিক আগে ওকে অরুণাংশু প্রায়ই দেখিত,—বিশ্রীরুচির চুল ছাঁটা, ফিনফিনে কাপড় পরা, সারাক্ষণ সাইকেল চড়িয়া টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এক বছরের পর বাপ মারা যাওয়াতে ও নিজেই যে জমিদার হইয়া বসিবে তা অরুণাংশু এখানে আসিয়া মাত্র শুনিয়াছে। জমিদার বলিলেই কেন জানি অরুণাংশুর মনে হয়,—ঈয়া মোটা দেখিতে, ভুঁড়ির পরিধি ঢাকিতে গেলে কোচার কাপড় আর অবশিষ্ট থাকে না, এবং মস্ত লম্বা একটা গোঁফ।

অমনিই না এ সব ভাবিয়া অরুণাংশু ওদিকে তাকাইয়াছিল জানা নাই। চাহিয়া দেখিল বাড়ির একদিককার ব্যাল্‌কোনিতে সেই ছোক্‌রা জমিদার দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ঠিক দাঁড়ানও নয়। প্রসন্নবাবুর বাড়ির জান্‌লার দিকে মানুষটা এমনি হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং এতটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে পড়িয়া না যায়।

অরুণাংশু একবার চাহিয়া দেখিয়াই সবিরক্তিতে চোখ ফিরাইল। গান তো অনেকেই শোনে, তাতে ঐ রকম হাঁ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িবার কোন্ প্রয়োজন। তাছাড়া মেয়েরা ঘরে বসিয়া গাহিতে থাকিলে ভদ্রলোকে ঐ রকম করে নাকি ?

অরুণাংশু আগাইয়া চলিল। অকস্মাৎ তার মনে পড়িল মায়ের কথা। ঐ জমিদার ছোক্‌রাই নাকি সুজাতাকে বিয়ে করিতে চাহিতেছে! বিচিত্র নয়,—জমিদাররা বোকাই হয়! নইলে আর বিয়ে করিতে চাহিবে কেন! কিন্তু বিয়ে করিতে চাহিতেছে বলিয়াই বুঝি অম্‌নি করিয়া জাল্‌না দিয়া উঁকি দিতে হইবে,—তা ওদিকের জানলাটা জমিদার বাড়ির উপর আর ছোট্ট বারান্দাটুকুর খুব কাছে নাই বা হইল। আর সন্দেহ নাই, ঐ ছোক্‌রাই সুজাতাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। তা ঐ রকম হাবাগবা মানুষ বিয়ে করিবে না তো বিয়ে করিবে কে! কিন্তু সুজাতাকে বিয়ে করিতেই ওর সখ গেল কেন কে জানে! কিন্তু ঐ রকম ভাবে তাকাইয়া থাকা ?—ভারী বিশ্রী!

সারা সহরে ফাঁকা চুপচাপ্ জায়গা খুজিয়া না পাইয়া অরুণাংশু রেল লাইনেরধারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কদমগাছটার ভিতর দিয়া সপ্তমীর চাঁদটাকে দেখা যাইতেছে।

মানবের শত্রু নারী

দূরে ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌ সিগ্‌ন্যালের এদিক হইতে শুধু মাত্র নীল আলোটাই চোখে পড়ে।

একটু হাওয়া আসে।

পূজা-বাড়ি হইতে বাদ্যের শব্দ আসে। আকাশের বুকে একটা হাউই তার বিচিত্র রঙের ক্ষণিক আল্পনা আঁকিয়া দিল।

লাইন-পাশের হিমে ভিজা ঘাসের উপর দিয়া অরুণাংশু আগাইয়া চলিল। কে জানে এখানে সাপ আছে কি না! বাস্‌রে, ব্যাঙের যা কনসার্ট সুরু হইয়াছে। রাত্রি দশটার আগে সে বাড়ি ফিরিবে না! বেশ তো পাথরগুলি জ্যোৎস্নায় চকচক করে। বিশ্রী একটা গন্ধ আসিতেছে না? দূর, মন্দ কি, এটা হয়ত কোন বুনোফুলের গন্ধ হইবে। আকাশের ঐখান হইতে একটা উল্কা ছুটিয়া পড়িল। মাটী অবধি পৌছুবে কিনা কে জানে! বাস্‌রে, কি উঁচু তালগাছ দুটো,—মস্ত দুটো কালির পোঁছ মনে হয়। আর,—

কী অসভ্য ঐ ছোক্‌রাটা! অমন করিয়া সে সুজাতার ঘরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে কেন? কান টানিয়া দিলে রাগ মেটে! আদেখ্‌লা কোথাকার! ঈস্‌, ভারী তো জমিদার! ক'টাকা আয়? আহা, কী চমৎকারই না ওকে দেখতে!

আঃ, সুন্দর হাওয়া আসিতেছে। বাঃ রে, এখনই বুঝি বাড়ি ফিরিবে! তাছাড়া মাথাটা মিছিমিছিই গরম হইয়া উঠিল,—দূরের গ্রামটাকে জ্যোৎস্নার কৃপায় এখান হইতে ছায়াছবির মত দেখায়!

অরুণাংশু শুধু হাঁটিয়াই চলিল।

জ্যোৎস্না, পাতার স্পন্দন, ছায়ার টুক্‌রা, অনেক কিছু চোখে পড়িল।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা,—ঐ জমিদার ছোক্‌রা অমন করিয়া তাকাইয়া থাকিবে কেন! কী অধিকার আছে ওর!

যে-পথ দিয়া অরুণাংশু গিয়াছিল সে পথ দিয়াই সে ফিরিয়া আসিল। ও রাস্তাটা সহরের একটা প্রান্তে। এরই মধ্যে লোক চলাচল কমিয়া আসিতেছে। এমন কি প্রায় নাই বলিলেই চলে।

কী আশ্চর্য্য, সুজাতা গান গাহিতেছে নাকি এখনো। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতায় মৃদু গানের আল্‌পনা এখান হইতেই টের পাওয়া যাইতেছে। এই তো জমিদার বাড়ী,—যাক্ ছোক্‌রাটা আর এখন পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া নাই। নইলে অসভ্যটাকে হয়ত একটা ঢিলই ছুঁড়িয়া মারিতে হইত। ঠিক, আর ভুল নাই, গানই বটে। মেয়েগুলো আদত জানোয়ার,—এতক্ষণ ধরিয়া, মাথা সুস্থ থাকিলে, কেউ সমানে চেঁচাইতে পারে না! চমৎকার বই স্বামী প্রস্তরানন্দের 'মানবের শত্রু নারী'। যেমনটি তিনি যা বলিয়াছেন, তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সটান্ মিলিয়া যাইতেছে! দূর, অত চম্‌কাইয়া উঠিল কেন, সাপ না মোটেই। শুধু মাত্র একটা পাটের দড়ি!

উপরতলার যে-ঘর হইতে সুজাতার গান ভাসিয়া আসিতেছিল তার নীচেকার রাস্তায় আসিয়া কিন্তু অরুণাংশু সহসা চমকাইয়া উঠিল। ঘুরিতেছে কে রাস্তার এখানে? চেনা চেনাই মনে হয় যেন।

আরেকটু আগায় সে। তারপরই,—আরে এ যে সেই ব্যালকনির তরুণ জমিদার! এক মুহূর্ত্তে অরুণাংশুর মাথায় আগুন দপ্ করিয়া উঠিল। কী চায় এটা এখানে? ফাজলামির আর জায়গা পায় না! এর নির্লজ্জতা অসহনীয়,—দিবে নাকি নাকের উপর একখানা তাজা ঘুষি লাগাইয়া।

মানবের শত্রু নারী

কী যে অরুণাংশু করিয়া বসিত কে জানে। কিন্তু এমন সময় এক দম্‌কা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া ওর বুদ্ধি ফিরাইয়া দিল। চমকিয়া উঠিয়া নিজেই ভাবিল, এ সে করিতে বসিয়াছিল কি? মাথা খারাপ না হইলে এমন কল্পনাও করিতে পারে নাকি কেউ! ছোক্‌রা এখানে ঘুরিতেছে তো তার কি! সরকারী রাস্তা,—এখানে যার খুসী পায়চারি করিবে,—এতে তার আপত্তি করার কোন্ অধিকার! তাছাড়া এই ছোক্‌রার সাথেই তো ওবাড়ির ঐ মেয়েটার বিয়ের কথা চলিতেছে,—না ঐ রকমই কি মা বলিল। এ অবস্থায় তার নিজের মাথা গলাইতে যাওয়াই তো বোকামী হইত! হয়ত ক'দিন পরেই এই ছেলেটা এ-বাড়ির জামাই হইয়া জাঁকাইয়া বসিবে। আর অরুণাংশু কোথাকার কে!

অরুণাংশু ছেলেটার পাশ দিয়া আগাইয়া আসিল। একবার বাঁকা চোখে বিরক্ত ভাবে চাহিয়াও দেখিয়াছিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আর কোনো দিকে সে চাহিল না,—এবং যখন সিমেণ্টে পা পড়িল তখন দেখিল এ তাদের বাড়ির সিঁড়ি।



সাত

অরুণাংশু উপরে উঠিয়া গেল। বারাণ্ডার ঠিক চলিবার জায়গায় চেয়ার থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু ছিল,—এবং অরুণাংশু গিয়া তার সাথে ঠোক্কর খাইল। আঘাত লাগিয়াছিল মন্দ না, কিন্তু ওর আর্ত্তনাদ করিয়া বেদনা প্রকাশ করা নয়,—হাতল ধরিয়া চেয়ারটাকে ও দুম্ করিয়া এক দিকে ছুঁড়িয়া দিল। যত রাজ্যের যত হত-ভাগাগুলি চাকর জুটিয়াছে এ বাড়ির,—কারুর চোখে যদি এ পড়ে! না হয় সে যাইতেছিলই বা অন্যমনস্ক হইয়া, কিন্তু তার জন্য পথের মাঝখানে একটা চেয়ার ফেলিয়া রাখিতে হইবে যেন!

অরুণাংশু ঘরে ঢুকিয়া অভ্যাস মত দরজার ধারের সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালাইল। কিন্তু আলো হইতেই ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আরেঃ,—এ কোন্ ঘরে আসিল আবার,—আরো দু-দুটো ঘর আগাইয়া গেলে তবেই যে তার নিজের ঘর—সে খেয়াল নাই। বিরক্ত হইয়া অরুণাংশু বাহির হইয়া আসিল।

ও-বারান্দা হইতে রাস্তাটা দেখা যায়। বাদাম গাছটা, পথের বাঁক, আর তার পরেই,—কী অসভ্যরে ছোঁড়াটা,—একজন মেয়ে গান গাহিতেছে, আর তার ঘরের নীচের রাস্তা দিয়া হাঁটাহাঁটি করিতে হইবে! একটা চড় বসাইয়া দিলেই ভাল হইত। এই রকম করিলে বুঝি মানুষের সহ্য হয়!

মানবের শত্রু নারী

উঃ,—দরজাটার সাথে গিয়া অরুণাংশু ধাক্কা খাইল। এবং তার ফল এই হইল যে একটা ছোট ছেলের মত বিচারহীন আক্রোশে ও দরজাটাতেই ভুম্ ভুম্ করিয়া কটা ঘুসি বসাইয়া দিল। ওর সব কিছুকেই ঘুষি মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। সাদা দেওয়ালগুলিকে, গাছটাকে, আকাশ, চাঁদ সবাইকে। কেউ যদি ওকে এখন রাগাইত তবে আর তার রক্ষা ছিল না।

অবশেষে অরুণাংশু তার নিজের ঘরে পৌছিল।

জামার বোতামটা খুলিতেছে না,—কী জ্বালাতন রে! এক টান্ দিয়া অরুণাংশু সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। স্যাণ্ডাল? স্যাণ্ডাল কোথায়? যত জুতোর গাদা জড়ো হইয়াছে,—দারুণ রাগে পা দিয়া সে সাজান যত সব জুতোগুলিকে ঘরের চারদিকে ছিট্‌কাইয়া দিল। ঘরের সব কিছু সে চুরমার করিয়া দিবে!

তারপর হঠাৎ গিয়া মাটীতে পা রাখিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল। এটা ওর স্বভাব নয়। অসময়ে ও কখনো বিছানায় শোয় না,—তাছাড়া হাত পা না ধুইয়া, অমন রাস্তার ময়লা লইয়া তো নয়ই। কিন্তু পূরা এক মিনিট অরুণাংশু শুইয়া রহিল। তারপর যেমন অকস্মাৎ সশব্দে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল তেমনি আবার উঠিয়া বসিল। তারপর সম্পূর্ণ অকারণে গিয়া জান্‌লার একটা কাচের মধ্যে ঘুষি বসাইয়া দিল।

ঝন্ ঝন্ শব্দে টুক্‌রা টুক্‌রা কাচ ঝুরঝুর করিয়া নীচে পড়িল। এবং সাথে সাথে অরুণাংশুর হাতের অনেক অলক্ষ্য ছিদ্র দিয়া তাজা রক্তের ধারা ছুটিয়া বাহির হইল,—দেয়ালীর দিনের ফুলঝুরির মত।

কাচ ভাঙার শব্দ শুনিয়া একটা চাকর ও পাশের ঘর হইতে রেণুকা ছুটিয়া আসে। অরুণাংশু তখন বাঁ হাত দিয়া ডান হাতের পাতা চাপিয়া ধরিয়াছে,—আর ওর কাপড়ে চুয়াইয়া পড়িতেছে রক্তের ফোঁটা।

দেখিয়াই তো রেণুকা সভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল, এ কী?

অরুণাংশু গম্ভীর ভাবে কহিল, কিছু নয়।

কিছু নয়? মাগো, টস্‌টস্‌ করে রক্ত পড়ছে।

পড়ুক গে।

বাঃ রে!—। তারপর চাকরটাকে কহিল, শ্যাম, তুই শীগগিরি করে জল নিয়ে আয় তো। আয়োডিন আনব দাদা?

অরুণাংশু কহিল, কারুর কিছু আনতে হবে না। যা করবার নিজেই করব আমি। কচি খোকা নাকি যে—হৈ চৈ করতে হবে।

চাকর শ্যাম কহিল, আজ্ঞে জল একটু আনি, ধুয়ে ফেল্‌বেন।

অরুণাংশু চীৎকার করিয়া কহিল, চুপ রও। কী চাস্‌ এখানে তুই? যা শীগ্‌গির, ডাক্তারী করতে হবে না।

অরুণাংশুর সেই কারণ-হীন রাগটা আবার ফুলিয়া উঠিতেছে। চাকর-বাকর সবাই মাতব্বরী করিতে আসিবে। দিবে নাকি ওকেই একটা থাপ্পড়! এখনো যাইতেছে না? আর সহ্য হয় না। যাক্‌,—বাঁচা গেল! এখনো ওটা না গেলে কী যে অরুণাংশু করিয়া বসিত কে জানে!

নিজেই অরুণাংশু ধুতির একটা অংশ দিয়া হাতটা জড়াইয়া ফেলিল। হাত কাটিয়াছে ওর নিজের খুসী,—কার তাতে কি?

রেণুকা অরুণাংশুর ভাবগতিক দেখিয়া আর কিছু বলা নিরাপদ মনে করে নাই। ঠেকিয়া ও শিখিয়াছে এমন সব জায়গায় চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ,—কিন্তু একেবারে মুখবন্ধ করা ওর স্বভাব নয়।

কহিল, কি, কাচে ঘুসি লাগিয়েছিলে বুঝি ?

আরুণাংশু কহিল, বেশ করেছিলুম।

কেন ?

ইচ্ছা। তুই যাবি কিনা বল্ ?

উত্তর দিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই রেণুকা পালাইল।

অরুণাংশুর মোটেই খাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু খাওয়া না খাওয়া মায়ের কাছে থাকিলে তো আর নিজের ইচ্ছায় হয় না। আর এতো রেণুকা নয় যে ধম্‌কাইয়া তাড়াইবে।

কিন্তু ডালে হলুদ বেশী হইল, তরকারী নুনে বিষ, মাছে গন্ধ! বেশ তো আর কারুর অমন মনে নাই হইল, কিন্তু ওর অমন লাগিলে কি করিবে! ক্ষুধা নাই তাই অমনতর করিতেছে? তাতেই বা কী, ওতো খাইতে চাহেই নাই! না না, আর কিছু করিয়া দিতে হইবে না। আঃ, কি জ্বালাতন, বলিতেছে আর কিছু লাগিবে না! তবু বিরক্ত করা!

প্রায় কিছুই অরুণাংশুর পেটে পড়িল না।

ওর ভাল লাগিতেছে না কিছুই। দূর! আঃ! ছাই! কিন্তু কেন যে দূরও ছাই তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু মহা বিরক্তিতে ওর মন ভরিয়া আছে।—কী অসভ্য ছেলেরে বাপু, মেয়েদের জান্‌লার

তলায় দাঁড়াইয়া থাকা! সত্য সত্যই একটা চড় মারিলে তবে রাগ যায়! ক'পয়সার জমিদার?

অরুণাংশুর হাতটা নিশপিশ করে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ডান হাতটা যে ব্যথায় টাটাইতেছে তা প্রায় ওর মনেই হয় না। ইচ্ছা করে জগত চরাচরে যা কিছু আছে সব কিছুই নির্ব্বিচারে ভাঙিয়া ফেলে, আর দেওয়ালের ফটোগুলি, ও বড় আয়নাটা ডাম্বেলটা ছুঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেয়। বিজ্‌লী আলোর বাল্‌বটা ফাটাইয়া দিবে নাকি?

জান্‌লাটার কাছে গিয়া কতক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র, তারপর আসিয়া বসিল টেবিলের উপর। পা দিয়া চেয়ারটাকে উল্টাইয়া ফেলিল। ওঃ, একটা ঝড় যদি ওঠে এখন, কিংবা যদি একটা ভূমিকম্প হয়!

কিছুই যখন আর ভালো লাগে না, তখন অরুণাংশু আলো নিবাইয়া সটান্ বিছনায় গিয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুম আসিতেছে না। শুইয়া পড়িলে অন্যদিন অরুণাংশুর ঘুম আসিতে বড় জোর দেড় মিনিট লাগে। একেবারে দেড় মিনিট লাগে না এমন নয়! কিন্তু আজ কী হইয়াছে ভগবান জানেন,—লক্ষ্মীছাড়া ঘুমটা আসে না কেন। কী গরম আজ! আঃ,—আর এই মশা! এরকম জঙ্গলে ভদ্রলোক থাকে নাকি আবার!

গাছের পাতার শব্দ শোনা যায়! কী হতভাগা পাখী ঐ প্যাঁচাগুলি। একটু ঘুম আসিতেছিল তাও ভাঙাইয়া দিল। এবং আর সময় পাইল না, যত রাজ্যের শিয়ালগুলি অত্যন্ত অকস্মাৎ

চীৎকার করিয়া উঠিল। ইষ্টিশানে হয়ত বা কোনো মালগাড়ি আসিয়া থাকিবে। একটা ইঞ্জিনের ক্ষীণ সিটি শোনা গেল! রাত কত হইয়াছে কে জানে। চাঁদটাকে আর দেখা যায় না,—হয়ত কৃষ্ণচূড়াবনের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। রাত্রে টিকটিকিগুলির শব্দও এত হয়।

অরুণাংশুর মাথাটা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘুম আসা প্রায় অসম্ভব। নাঃ, ঘামে ভিজিয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়া অরুণাংশু শক্ত বিছানাটা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছে কিনা কে জানে! হাতের কাটার ব্যথাটা এতক্ষণে চাড়া দিয়া উঠিল। উঃ,—দূর্ ছাই!

হাওয়া লাগিলে মাথাটা হয়ত ঠাণ্ডা হইতে পারে। জান্‌লাটার ধারে আসিয়া অরুণাংশু চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চারদিকে এখন আর জ্যোৎস্না নাই,—একটা আব্‌ছায়া প্রায় অন্ধকারে পরিণত হইবার জোগাড়। পথের বাঁকের বাদাম গাছটা চোখে পড়ে। তার উপরেই একটা তারা জ্বলজ্বল করিতেছে। একরাশ আব্‌ছায়ার মত দূরে একটা খড়ের গাদা চোখে পড়ে। একটা জংলা গন্ধ আসিতেছে।

নিঃশব্দে অরুণাংশু ঐখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারারা পৃথিবী হইতে কত যোজন দূরে কে জানে। কিন্তু তবু ঘুম-হারা চোখে যুগের পর যুগ তা'রা নিদ্রিত ধরার দিকে চাহিয়া থাকে। কোন আকর্ষণে যে থাকে, কে জানে তা। আর কত কাল থাকিবে অমন্ করিয়া? চির-কাল নাকি?

ঘরের ভিতরটা অরুণাংশুর অসহ্য মনে হইতে লাগিল।

ওর রাত জাগার যত অস্বস্তি যেন এখানে ভীড় করিয়া আছে!

অন্ধকার বারান্দাটায়ও অরুণাংশু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল! কিছু ভাবিতেছে কিনা তা সে নিজেও বলিতে পারে না। কখনো কখনো রাত্রিচর পাখীদের কর্কশ ডাক শোনা যায়। অন্ধকারেও এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া প্রায় সব কিছুই দেখা যাইতেছে। চিরদিন আলোর মধ্যে দেখা সব কিছুর একটা নতুন রূপের সাথে পরিচয় হইল।

সিঁড়ি দিয়া অরুণাংশু নীচে নামিয়া আসিল। একবার ওর মনে হইল, স্বপ্নের ঘোরে চলিতেছে নাকি? চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তারপরই,—দূর, তা কেন। সমুখের বাগানটায় একটু হাঁটিবে। উপরের চাইতে নীচের এই জায়গাটাই ঠাণ্ডা বেশী হইবে বোধ হয়। বাঃ, চমৎকার গন্ধটাতো! কী ফুল এটা? মাথাটাতে সামান্য হিমটুকু লাগিতেই কিন্তু ওর বড় আরাম লাগিতেছে! গাছের পাতা, না শূন্যে খানিকটা ছায়া দুলিতেছে? আঃ, এমনটা হইলে শীগ্‌গিরই ঘুম আসিয়া পড়িবে!

জ্যোৎস্নার যা একটু আভাস ছিল তা ও লুপ্ত হইয়াছে। অন্ধকার আকাশে সংখ্যাতীত তারা ফুটিয়া উঠিল।

পায়ের তলাটা একটু যেন শক্ত বোধ হইতেছে। এ দিকটায় ঘাস নাই বোধ হয়। অরুণাংশুর নিজের বিছানাটাও এম্‌নি শক্ত। কোমলের মধ্যেও মাধুর্য্য আছে,—একবারে নাই, এমন নয়। আচ্ছা, মাটীতে গাছের ছায়া পড়িলে কি রকম জানি দেখায়, তার ঠিক

উপমা মনে হইতেছে না। ঠিক, হইয়াছে। কোজাগরীর সময় মা যেমন আল্‌পনা দেন, তেমনিতর দেখিতে! আর,—

এ কী? বাঁ দিকটায় ঐ বড় বাদাম গাছটা কেন? বাড়ির গেট্ খুলিয়া কখন্ বাহির হইল সে। হ্যাঁ, ভুল নয়ত, এটাতো রাস্তাই বটে! সঙ্গে সঙ্গে একটা চমকানি অরুণাংশুর সমস্ত শিরায় বিজুলির মত ছুটিয়া গেল। এ কি জাগরণ না স্বপ্ন? চোখে হাত দিয়া অরুণাংশু দেখিল,—তা'রা বন্ধ নয়। তবে? মাথাটা কি সত্যই খারাপ হইয়া গেল নাকি? এ কি মায়া, এ কি ভোজবাজী?

মধ্য-নিশায় সমস্ত জগত যখন চোখ মুদিয়াছে,—সাড়া নাই, শব্দ নাই, এবং বোবা অন্ধকার নিঃশ্বাসও ফেলে না, তখন অরুণাংশু স্বপ্নগ্রস্থের মত অকারণে একাকী সুজাতার জানালার তলায় দাঁড়াইয়া আছে!

অরুণাংশু চমকাইয়া উঠিল! তারপর আর একবার মাত্র ভয়ার্ত্ত চোখে উপরের দিকে তাকাইয়া সহসা অরুণাংশু পাগলের মত সমুখ দিকে ছুটিয়াছে! কী হইল এ সব,—কী এর অর্থ, এমনি করিয়া সে কখন্ আসিল!

কিন্তু আজ কি সমস্ত রাতটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে নাকি? রাত্রিই কি স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়াছে! অরুণাংশু সহসা থামিয়া গেল। ফিরিয়া সে যখন আবার সুজাতার জানালার তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সে স্পষ্ট শিহরিয়া উঠিতেছে। হ্যাঁ, সে শিখিয়া লইয়াছে কেমন করিয়া জানালার তলায় হাঁটিতে হয়। অন্ধকার,—চমৎকার অন্ধকার। কোথা হইতে গন্ধ আসে এমন!

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়াও সে রাতে অরুণাংশুর আর ঘুম আসিল না। ঘুম্ আসিতেছে না কিছুতেই! নাই বা আসিল।

আট

পরদিন ভোরে অরুণাংশুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অলীক বলিয়া মনে হইল। স্বপ্ন দেখিয়াছে হয়ত! নইলে অমন্ পাগ্‌লামী করাও সম্ভবপর হয় বুঝি! সারাটা রাত কী অদ্ভূত ভাবে যে কাটিয়াছে তার ঠিক নাই। অমন করাও বুঝি কারুর দ্বারা সম্ভব! সারারাত পাতা নড়া, একটু জংলা গন্ধ, অশান্ত পায়চারি,—আর অকারণেই ওর চোখ দুটী একটু যেন সজল হইয়া উঠিয়াছিল। দূর, তাই না আরো কিছু,—একদম অসম্ভব।

কিন্তু অরুণাংশু মনে মনে বেশ জানে ও সব মোটেই স্বপ্ন নয়। যতই নিজেকে ভুলাইতে চাক্, মন কি আর ভোলে। তাই তাড়াতাড়ি ও 'মানবের শত্রু নারী' খুলিয়া লইল। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে উপরের যে জায়গায় 'শত্রু' কাটিয়া অন্য একটা কথা বসান হইয়াছে। কে কাটিয়াছে ওটা? রেণুকা তো স্বীকার করে না,—ও বলে ওর হাতের লেখা মোটেই ঐ রকম নয়!

একপাতা, দু' পাতা, তিন পাতা,—বহুবার পড়া পাতাগুলিই অরুণাংশু উল্টাইয়া যায়। জগত সম্বন্ধে, নারী সম্বন্ধে, ওর অভিজ্ঞতা খুবই কম। 'মানবের শত্রু নারী' হইতেই ও অনেক জ্ঞান আহরণ করিয়াছে। কোনদিন তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ হয় নাই। শাস্ত্রের কত জায়গা এবং নিজের সদুঃখ অভিজ্ঞতা হইতেই একজন সাধু বইটা লিখিয়াছে। এই বইয়ের তুলনা হয় না!

মানবের শত্রু নারী

সমস্ত রাত জাগিয়া অনেক দেরী করিয়াই অরুণাংশু আজ উঠিয়াছিল। রোদ উঠিয়াছে, প্রখর রৌদ্র। পড়িতে আর ইচ্ছা হয় না, কিন্তু পড়িতেই হইবে তাকে। মনটা শান্ত করার বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

আচ্ছা, কাল রাতে যদি ঐ মেয়েটা তাকে দেখিয়া ফেলিত? যদি হঠাৎ তার ঘুম ভাঙিয়া যাইত, আর সে আসিয়া দাঁড়াইত জানালার পাশে? কী হইত তবে? লজ্জায় তা হইলে আর সারা জগতের কাছে মুখ দেখান যাইত না। অমন ক্ষ্যাপামীতেও লোককে পায়,—কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল নাকি? অন্য কেউ হইলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু সে, নিজে,—একেবারে অমার্জ্জনীয়! 'মানবের শত্রু নারী' পড়িয়াছিল তবে কোন্ কাজে,—এতদিন ওকে অতটা শ্রদ্ধা করিবার তবে আর কোন্ ঠেকা ছিল! কী নিস্তব্ধ ছিল, কাল রাতটা! অন্ধকারে বাদাম গাছটাকে কী চমৎকারই দেখাইতেছিল! রাস্তাটা যেন ঠিক ঘুমাইতেছিল। আর অন্ধকারে ঐ বাড়িটা কেমন জানি, রূপকথায় শুধু তার একটা উপমা পাওয়া যায়! টিকটিকির শব্দে কেমন চমকিয়া উঠিয়াছিল। আর ঐ,— দূর ছাই, পড়া ছাড়িয়া ভাবিতেছে কী এ সব!

তাড়াতাড়ি মাথাটা নাড়িয়া অরুণাংশু বোধ হয় সব কল্পনা তাড়াইতে চেষ্টা করিল! এ বইটাকে আজ আবার সম্পূর্ণ পড়িতে হইবে!

বড়. বড় আদর্শের কথা বলা হইয়াছে এই 'মানবের শত্রু নারীতে'। ভোগ একদম বর্জ্জন করিতে হইবে। জগতটা মিথ্যা,—মায়া বাড়াইয়া

আর লাভ কী। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই যেন সংসারে অনাসক্ত হইতে যত্নবান্ হয়! উঃ,—এর চেয়ে বড় কথা জগতের আর কোন দর্শন বলিতে পারিয়াছে। দর্শনের একেবারে শেষের কথা।

এক পাতা, দু পাতা, তিন পাতা,—পাতার পর পাতা অরুণাংশু উল্টাইয়া যাইতেছে। সকল রকম দুর্ব্বলতার এমন্ কড়া জবাব আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অপূর্ব্ব বই এই 'মানবের শত্রু নারী'!

কিন্তু সহসা এ কী! বাহিরে কাহার যেন গলার স্বর শোনা গেল! এবং শোনা মাত্র অকস্মাৎ বইটী অরুণাংশুর হাত হইতে একেবারে নীচে পড়িয়া গেল। হাতে আর একটুকুও জোর নাই, যেন একটা অসীম দৌর্ব্বল্যে তাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সুজাতা ক'দিন এ বাড়িতে আসে নাই। অরুণাংশু জানেনা, অনেকটা তার উপরই অভিমান করিয়াই ও আসা বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সুজাতার কোন কিছুই বেশীক্ষণ মনে থাকে না। আজ আসিয়া ওর এতই উচ্ছ্বাস আর এত অজস্র হাসি সুরু হইয়াছে, যে তাকে চাপিতে গেলে শুধু উল্টা ফল হয়। ও যেন একটা জল-প্রপাত,—কথা বলার আর খুসীর অন্ত নাই।

রেণু তুই কী দুষ্টু বল্‌তো,—যাস্‌নি কেন আমাদের বাড়িতে একদিনও? বাঃ রে, আমি না এলে বুঝি আর যেতে হবে না। বেশ কথাতো! হা হা,—সুন্দর দেখাচ্ছে? দেখাবেই তো,—কী একখানা চেহারা আমার,—যেন মন্থরার সহোদর বোন্। আজ দুপুরে তেঁতুল মাখা খাবি? জ্বরকে ভয় পাই নাকি? আসুক মা,—শুয়ে

শুয়ে এম্‌ব্রয়ডারি করব,—ক্ষতি কি! যাবি আজকে পূজো দেখতে,—মাগো যা ম্লেচ্ছ আমরা, মা দুর্গার চেলারা শেষে প্রবেশ-নিষেধ না করে দেয়। সারা রাত কাল যা ঘুমিয়েছি তা আর বলার নয়,—কি মজার একটা স্বপ্ন দেখেছি জানিস্? যেন মস্ত বড় একটা ঢোল কাঁধে চড়িয়ে পূজো বাড়িতে আবোল তাবোল্ বিস্তর বাজাচ্ছি, আর,—মাগো, হেসে আর বাঁচিনে। ঢোল-আলা গুলো কি রকম নাচে দেখেছিস্?

অরুণাংশুর সারা শরীরে কারণ-হীন একটা শিহরণ পড়িয়াছে? কী, ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিল নাকি? কুইনাইন খাইতে হইবে? তবে? তবে কী এটা? এমন আর কোনো দিন হইয়াছে বলিয়া তো ওর মনে পড়ে না! কী এর অর্থ?

সুজাতার কথার আর শেষ নাই। কত কথাই ও যে বলিতে পারে! আর এম্‌নি জোরে বলিবে যে আশে পাশের কারুর আর তার প্রত্যেকটা শব্দ না শুনিয়া উপায় নাই! কিন্তু ওর গলাটা মিষ্টি,—সেটা অস্বীকার করা যায় না।

চুপ করিয়া অরুণাংশু বসিয়া রহিল। কী হইল সব,—দূর ছাই, সব কিছুই যে ঘুলাইয়া যাইতেছে!

এমন সময় মায়ের গলা শোনা গেল। বাইরে সে নিশ্চয়ই সুজাতার সাথে কথা জমাইয়া দিয়াছে। অরুণাংশু সব শোনে না, কিন্তু যতই সে ঔদাসীন্যের ভাণ দেখাক্, সে-সব কথা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে না, এমন নয়। কিন্তু তা শুধু অমনি,—কেউ কথা বলিলে তা শুনিতে ইচ্ছা হয় না বুঝি? আর কিছু নয়!

হ্যাঁ মাসীমা,—মা তো আসবে বলেছে, হয়ত আজকে দুপুরেই আসবে। দেখুন তো, রেণুকা আমাদের বাড়ী যায় না কেন? আমি বুঝি শুধু শুধু আসব। ওঃ,—হাতের এই আঁচড়টা? কে আবার, বাদল দিয়েছে। ওর সঙ্গে কাল যুদ্ধ করলুম কিনা,—হা হা। বলে, মেয়েদের গায়ে জোর নেই। পাজীটাকে খুব ধরে কিলিয়ে দিয়েছি। খাব? কী লোভের কথা! কিন্তু মাসীমা,—পেটে কি আর জায়গা আছে নাকি।

অরুণাংশুর আর পড়া হইল না। ঘরের মধ্যে সে প্রায় টলমল করিতে লাগিল। কী যে মেয়েটা কথা বলিতে পারে,—সারাক্ষণ ওর হাসি। ওর গলাটা মিষ্টি। ওর নাম বুঝি সুজাতা? অর্থ কি তার?

এক সময় রেণুকা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, ওরে বাবা, দরজার কাছে অমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বুঝি? আর একটু হলে ধাক্কা খেতাম যে।

অরুণাংশু কহিয়া উঠিল, হ্যাঁ, তোকে বলেছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

ছিলে না?

হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছিলুম না আরো কিছু। মাপ নিচ্ছিলাম, দরজাটার,—একটা পরদা না হ'লে ভদ্রলোকের চলে বুঝি?

ওঃ। কতটা বড় চাই,—ক'গজ?

কয় গজ? মাটী করিয়াছে। হাতের আশে পাশে টেপ থাকা দূরের কথা, দ'রজা মাপা যায় এমন একটা পেন্সিলও ছিল না। তাইতো,—বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে তো সে এইবার।

কহিল, পাঁচ গজ।

পাঁচগজ? বলো কি তুমি, একটা পরদা বুঝি পাঁচ গজ হয় কখনো?

দুটো হ'তে পারে না বুঝি? চুপ করতো, গিন্নীপনা করতে হবে না সবটাতে। কত যেন বোঝেন তিনি!

অকস্মাৎ রেণুকা কহিল, সুজাতাদিকে বিয়ে করনা দাদা তুমি!

অরুণাংশু প্রথমটা সত্যসত্যই একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা শুধু মাত্র একটুক্ষণের জন্য। তার পরই ও চেয়ার হইতে উঠিয়া রেণুকার দিকে তাড়া করিয়াছে,—তবে রে লক্ষ্মীছাড়ী, দেখাচ্ছি তোকে।

রেণুকা হয়ত আগের জন্মে হরিণী ছিল। কোন্‌খান দিয়া কখন্ যে ও অন্তর্দ্ধান করিল, তা প্রায় টেরও পাওয়া গেল না।

অন্যদিন হইলে এরপর অরুণাংশু উপদেশ ও চিত্তশুদ্ধির জন্য 'মানবের শত্রু নারী'র পাতা উল্টাইত! আজ কিন্তু তাতে ওর রুচি হইল না। নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া সমুখের রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সব কিছু যেন কেমন হইয়া গেছে। গাটা ওর বারবার কাঁটা দিয়া ওঠে, স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অবাস্তবতার মোহ থাকে, আজ ওর প্রত্যেকটী জাগার ক্ষণ তেমনতর মনে হইতে লাগিল। কে জানে কী যে মাতলামী ওর ঘাড়ে চাপিয়াছে! কতরকম যে মেয়েদের নাম হয়! ঐ মেয়েটার নাম সুজাতা,—তাই না?

রাস্তা দিয়া একটা লোক টবের গাছ বেচিতে লইয়া যাইতেছে। অরুণাংশুর কোন্ খেয়াল হইল, কে জানে। দুইটা পাম্ কিনিয়া ও ঘরের কোণার রোগা তে-পায়াটিতে রাখিয়া দিল। চমৎকার সবুজ

পাতা তো! আঃ, কাঁটার সাথে আবার একটা খোঁচা লাগিল। ওদের সাথে অতটা ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়, সেটা ভুলিলে আর চলে কি করিয়া!

আরেঃ, তার চুলে যে প্রায় জটা বাঁধিয়াছে। আশ্চর্য্য, এতদিন তো চোখে পড়ে নাই! আর চুল আঁচড়াইলেই বা ক্ষতি কি? এলোমেলো চুল থাকিলে বুঝি কম জ্বালাতন! স্বামী প্রস্তরানন্দের বইয়ে চুলের উপর ঔদাসীন্য দেখাইবার উপদেশ আছে। কিন্তু এ কি আর শুধুমাত্র বাবুগিরির জন্য সে আঁচড়াইতে চায়! অসুবিধা হয় না বুঝি? আর চুলগুলি এই রকম জঞ্জালের মত থাকিলে মানুষকে অদ্ভুত দেখায়ই তো! দূর, আয়নাতে কী বিশ্রী ছবি পড়িয়াছে, চুল এবার হইতে আঁচড়াইতে হইবে!

দুপুরবেলায় সুপ্রিয়াদেবী আসিলেন,—আর তার সাথে যে সুজাতা আসিবে তাতো জানাই ছিল। মাদের ও মেয়েদের এম্‌নি গল্প সুরু হইল যে অরুণাংশুর আর সুস্থিরতা রহিল না। কোন্ জায়গার প্রতিমা ভাল হইয়াছে,—রংতা বিলাতী, পূজায় কি সব নতুন রেকর্ড বাহির হইয়াছে, মাছ মোটেই ভাল পাওয়া যাইতেছে না, সেদিন কাঁচা কাঁচা ক'টা কমলা লেবু আনিয়াছিল, আর ফুলকপি,—এমনই সব হরেক রকমের কথাবার্ত্তা।

সুজাতা রেণুকে টানিয়া আনিয়া বারান্দার একটা কোণায় গল্প করিতে বসিয়াছে। মা'র কাছে থাকিলে ইচ্ছা মত হাসা যায় না। গান করনা একটা রেণু! হ'লোই বা দুপুর,—তার জন্য গান গাইলেই বুঝি দোষ হবে। ঈস্, দেমাকে মেয়ের মাটিতে আর পা পড়ে না। হ্যাঁ, পা পড়ছে না ছাই,—পায়ে স্যাণ্ডেলটা আছে ঠাক্‌রুণ, সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন।

তারপর ওদের বসিয়া আর ভাল লাগে না। এ-ঘর ও-ঘর, ছাদ সিঁড়ি, ওরা ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

অরুণাংশুর কেন জানি প্রতিক্ষণই মনে হইতেছে, এই বুঝি বা ওরা আসিয়া তার ঘরে ঢুকিল। ওর তাতে একটু যে সশঙ্ক ভাব তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু যে একটা উৎকণ্ঠা তা নয়, এমন একটা ভাব ওকে কেতকী ফুলের হঠাৎ-গন্ধের মত দোলা দিতেছে, যাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলা যায় আগ্রহ। যখনই ঘরের কাছে কিছু একটা শব্দ হয় তখনই অরুণাংশু চমকিয়া ওঠে। দূর, কেউ ঘরে ঢুকিবে, তাই বুঝি সে মনে করিয়াছিল। পাগল! হ্যাঁ, সে হয়ত ভাবিয়াছিল,—অন্য কিছু একটা ভাবিয়াছিল নিশ্চয়ই। তার বহিয়া গিয়াছে কোন্ মেয়ে আসিয়া ঘরে ঢুকিল কি ঢুকিল না, তা ভাবিতে! ঐ যে কার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে না? তাড়াতাড়ি অরুণাংশু আড় চোখে চাহিয়া দেখিল। দরজার সাথে বিড়ালটা পরিত্রাণে মাথা ঘষিতেছে! অরুণাংশু একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল। বইটা কুড়াইয়া লইতে আসিয়া একবার সন্ত্রস্থ ভাবে বাইরে তাকাইয়াছিল, কিন্তু কাউকে দেখিতে পাইল না।

সুজাতা ও রেণু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কতবার অরুণাংশুর ঘরের কাছ দিয়া গেল। কতবার এ পথ দিয়াই ওরা ফিরিল। কি মুস্কিল হইয়াছে, অরুণাংশুর গায়ে মিথ্যামিথ্যাই হঠাৎ শিহরণ পড়ে কেন? ম্যালেরিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ঠিক তেমনও নয়। এ যেন একটা স্বপ্ন দেখার মত,—একটা সব ঘুলাইয়া যাওয়ার অনুভূতি!

এর পরে অরুণাংশু যে কাণ্ড করিয়া বসিল তা সে কোন দিন

কল্পনা করিতেও পারে নাই। টেবিলের উপর 'মানবের শত্রু নারী'টা পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ সেদিকে চোখ পড়িতেই ওর মনে সহসা একটা হিংস্র ভাব চাড়া দিয়া উঠিল। গুরু-বধের খবর ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়,—ধর্ম্মযুদ্ধে অর্জ্জুনমাত্র সে পাপ একবার করিয়াছিল। কিন্তু অরুণাংশু যেমন সহসা এবং বাহ্যতঃ কোন কারণ না থাকাতেও করিয়া বসিল, তার ইতিহাস বিরল। 'মানবের শত্রু নারীর' শত টুকরা করিয়া ছেঁড়া পাতাগুলি বাতাসে সাদা সাদা পোকার মত উড়িয়া কে যে কোন্ পথে গেল তার সন্ধান রাখা সম্ভবপর নয়।

যা খুসী অরুণাশুর তাই করিবে সে। বেশ, তার ইচ্ছা সে চুল আঁচড়াইয়া পরিপাটী করিবে, তার ইচ্ছা সে ভাল ভাল জামা পরিবে, আর,—হ্যাঁ, যা তার ভাল লাগিবে তাই সে করিবে,—নাই বা মিলিল তা সাধুর উপদেশের সঙ্গে।

আচ্ছন্নের মত অরুণাংশু ঘরের এধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে সুরু করিল। যাক্ ওর এত দিনের শেখা সব জ্ঞান লুপ্ত হইয়া, জগতটা রসাতলে যাক্, তাতেও ক্ষতি নাই। বেশ, এ যদি মায়া হয়, মায়াই ভাল। একেই মায়া বলে বুঝি? আগে কে জানিত মায়া এই রকম হয়। জগৎ ঠিক মত চলিতেছে তো,—না মাটাই স্বপ্ন হইয়া উঠিয়াছে!

ঘরে আর থাকা যায় না। ইচ্ছা হইতেছে উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে। যদি একটা পক্ষীরাজ পাওয়া যাইত! গ্রহে গ্রহে কত আকর্ষণের পথে টানুক না কেউ তাকে, নব নব তারকার আলোয় ও এমন সব পথ দিয়া ছুটিয়া চলিবে, যার শুধু একটা অস্পষ্ট ছবি ওর শিরা উপশিরায় শিহরিয়া উঠিতেছে।

মানবের শত্রু নারী

পাগলের মত রাস্তাটা দিয়া ও হন্‌হন্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিল। বাদাম গাছ, ঘুঘুপাখী, খড়ের ঘর, রৌদ্রের মধ্যে একটুকু ছায়া,—আর,—তাদের বাড়িতেই তো আছে সুজাতা। সেদিন টেবিলে ওর সবগুলি আঙ্গুল স্বচ্ছন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। আর কপাল হইতে ওর চুল তুলিয়া নেওয়া! আঙ্গুরের গুচ্ছের মত চুলগুলি,—ওঃ, মায়া বুঝি এই রকম! ভারী চমৎকার তো!

নয়

ক্রমেই অরুণাংশুর অবস্থা হইল প্রায় আবার-সাধিলে-খাইব গোছের। কিন্তু যখন দরকার ছিলনা, তখন কান ঝালাপালা করিত। অথচ এখন সে সম্বন্ধে কেউ আর কথাবার্ত্তা উঠায়ই না,—সবাই একদম চুপ্ চাপ! নিজেই বা সে-সব কথা উঠায় কি করিয়া!

তাছাড়া ঐ জমিদারটা,—ঈস্, ভারী তো জমিদার,—তিন বিঘার মালিক তো তার চাল্ দেখ না! আরেকদিন তাকাক্ দেখি ওটা,—একটা ঢিল মারিয়া সতর্ক করিয়া দিবে। কিন্তু ঢিল মারিলেই তো আর হইবে না। ছোক্‌রাটাকে জখম করাই তো আর তার শেষ উদ্দেশ্য নয়।

অরুণাংশু এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া আর উচিত নয়। কিন্তু অন্তত আরেকবার আক্ষেপের কথাটা না জানাইলে কেমন করিয়া আর অরুণাংশু আত্মত্যাগ করিয়া মাতৃভক্তি দেখায়। কিন্তু কী যে হইয়াছে মা'র, ওসব কথা আর উঠায়ই না। অরুণাংশুর যে দারুণ পাপ হইতেছে সে কথাটা ভাবিয়াও দেখেনা একবার। এই রকম করিলে আর কিছুতেই পারা যায় না।

যতই দিন যাইতে লাগিল, অরুণাংশুর ভয় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এক সময় ঐ বাড়ির ছেলেটাকেই ও বিবাহের একান্ত যোগ্য বলিয়া ঘৃণা দেখাইয়াছে। কিন্তু এখন ওর ক্রমশই উল্টা মনে হইতেছে। ঈস্,—ভারী তো জমিদার! কী বিয়ে করিবার

ইচ্ছা রে,—মরি আর কি! হাবা-বোকা সবাই বিয়ে করিবে,—এ যেন ভাত খাওয়ার মত সহজ, গিলিলেই হইল! জগতে কে যে বিবাহ করিবার যোগ্য এ-বিষয়ে অন্তত পক্ষে মনে মনে ওর আর বিনয় নাই। নিজেকে ক্রমেই ওর প্রায় ইস্কাবনের টেক্কা মনে হইতেছে,—ওর মত জগতে দুটী হয় না!

কিন্তু তা হইলে কি হয়, সবাই চুপ্‌চাপ্‌! দূর ছাই,—এদের সব হইয়াছে কী। অরুণাংশুর প্রায় রাগিয়া যাইবার উপক্রম। সবাই রাজ্যের যত অবান্তর কথা কহিবে, কিন্তু যেটা কাজের কথা, ভুলিয়াও যদি এখন আর তা বাহির হয়। অথচ ইতিমধ্যে ছোক্‌রা-জমিদার কি সব জোগাড়যন্ত্র করিতেছে কে বলিতে পারে!

ঘুমাইতে ঘুমাইতে সেদিন তো সহসা চমকিয়া জাগিয়াই উঠিয়াছিল। যাক্‌,—বাঁচা গেল, স্বপ্ন, সত্য নয়। কিন্তু সত্য হইয়া যাইতেই আর বাধা কি। তিন-পয়সার জমিদার,—ভারী তো একটা সে। এঃ,—কেষ্ট বিষ্টু যেন! ব্যাপারটা তার পক্ষে খুব আরাম করিবার মত নয়। লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে,—ওর ভয়ে অরুণাংশুর মনে আর শান্তি নাই। ঘুম হইতে উঠিয়াই ভাবে,—এই রে, সারিল বুঝি, কোন্ খবর না আজ শুনিতে হয়। অথচ মায়ের এই রকম ঔদাসীন্য দেখিলে কার না রাগ হয়,—একটু হুঁস্ থাকে যদি! ক'বার সে একটু বেশী রকম চেঁচাইয়া না করিয়াছে বটে,—তার জন্য নিজেরও তার কম অনুতাপ নয়,—কিন্তু তাই বলিয়া বুঝি মা চুপ করিয়া যাইবে একদম। নিতান্ত অবুঝদের লইয়া পড়িয়াছে অরুণাংশু,—কিন্তু নিজেই বা সে ও-প্রসঙ্গ তোলে

আর কেমনে। ট্র্যাজিডি গল্পেই ভাল শোনায়, কিন্তু নিজের জীবনে সেটা ফলিতে আসিলে আর উৎসাহ থাকে না।

দুপুর বেলায় নিজের ঘরে বসিয়া অরুণাংশু অসম্ভব সব কল্পনা করিতেছিল। ছোক্‌রা-জমিদারকে একদিন ঘুসো-ঘুষিতে চ্যালেঞ্জ করিলে কেমন হয়। ওর ফুলা গাল দুইটা তা হইলে বেশ করিয়া সমতল করিয়া দেওয়া যাইত। আর ভুঁড়িটা বুঝি কোমরের উপরে থাকে না, ওখানে যদি জয়ঢাক বাজান যায়, তবে নিয়মে আট্‌কাইবে নাকি? কিন্তু ডাকিলেই কি আর লড়িতে আসিবে ওটা! নিতান্তই ভীরু,—কাপুরুষ। অথচ বিয়ে করিবার সখটা পূরামাত্রা। যা না বিয়ে করগে, জগতে কত মেয়েই তো আছে,—কিন্তু এদিকে কেন? অরুণাংশুর রাগ কি আর অম্‌নি হয়!

এমন সময় মা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। দুপুরের খাওয়া এই মাত্র শেষ হইয়াছে। মায়ের যত ইচ্ছা আর অভিযোগ তার বেশীর ভাগটা এই অবসরের সময়ই অরুণাংশুকে শুনিতে হয়। আগে ও দুয়েকদিন বিরক্তই হইত। হয়ত 'মানবের শত্রু নারী'র একটা চমৎকার অধ্যায় পড়িতেছে, এমন সময় আসিয়া অত্যন্ত অসার আলাপ জুড়িয়া দিল। কিন্তু আজ কদিন হইতে মা আর আসিতে-ছিল না, অরুণাংশুর উল্টা তাতেই রাগ হইতেছিল। মাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে আশান্বিত হইয়া উঠিল। যাক্‌, বোধ হয় একেবারে ভোলে নাই।

মা কহিলেন, কি রে, পড়ছিস নাকি? তাহ'লে আরেক সময় আসব'খন।

আরেক সময়? আরেক সময় আসিবার আর কোন্ প্রয়োজন। এখনই সে শুনিতে প্রস্তুত,—বিলম্ব করিয়া আর কোনো লাভই নাই।

তাড়াতাড়ি অরুণাংশু কহিল, না না মোটেই পড়ছি না। ব'সো না মা তুমি।

মা কহিলেন, তোর যাবার সময় হ'য়ে আসচে বুঝি?

অরুণাংশু কহিল, হ্যাঁ, মা! তোমার বলবার থাকে যদি কিছু, তো বল না। চলে যাবার আর বেশী দেরী নাই আমার।

মা কহিলেন, না, বলার আর তেমন কি। বাড়িটা তৈরী হচ্চে, —কলকাতায় গিয়ে একটু খোঁজ খবর নিস্ তার।

ওঃ, এই, আর কিছু নয়,—আমি ভাব্‌লাম আর কিছু বুঝি!

না, আর কি বল্‌বো আবার। তাছাড়া কথা বল্‌লে কত শুনিস তুই,—বল্‌তে বল্‌তে তো হার মেনেচি।

অরুণাংশু মাতৃভক্তির নতুন একটা আদর্শ পৃথিবীর কাছে ধরিবে, —মা কি একটা চালাকি না কি,—স্বর্গাদপি গরীয়সী। বলুক মা, —অরুণাংশু এক্ষুনি রাজী হইয়া যাইবে। যাক্, মার যে খেয়াল ফিরিয়া আসিয়াছে এই যথেষ্ট,—নইলে ছোক্‌রা-জমিদার শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল অবস্থাটা। এবার তাড়াতাড়ি কিছু একটা না হইলেই অরুণাংশু গিয়াছে। মা'দের বুদ্ধিটুদ্ধি আছে। একেবারে নাই যে, তা নয়।

তাড়াতাড়ি সে নিজেকে বিলাইয়া দিবার সুরে কহিল, না, তোমার কথা শুনেচি বৈকি,—বেশ তো, একবার বলেই দেখনা শুনি কিনা।

মা কহিলেন, যাক্, এই সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাক্‌লেই হয়। দেখ্ স্বাস্থ্য হচ্চে সবার ওপরে। দুধ না খেলে শরীর থাকে নাকি কখনো!

শুনিয়া অরুণাংশুর তো চক্ষুস্থির! এরই জন্য এত ভূমিকা। আর দুধের জন্যই এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে। নিজের গালেই ওর একটা চড় বসাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কেউ ঘরে না থাকিলে মাথার চুল টানিয়া ছিঁড়িত। দুধ! ভারী তো দুধ! আর কিছু বলিবার পাইল না মা! কোনো কিছুর খেয়ালই যদি এদের থাকে,—ছাই, ভালো লাগেনা! বিশ্বসংসারে এত কিছু আছে, দুধ খাওয়া ছাড়া মা আর কি কিছু করিতে বলিতে পারিল না!

কিন্তু তারপরও কি মা দরকারী কথার দিক দিয়া যায়। খাওয়া পরার কথা, আত্মীয় স্বজনের সংবাদ, গল্প,—যত রাজ্যের যত অবান্তর কিছু, তাঁর দিকেই মা'র ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

মা কি কথা কহিতেছে, অরুণাংশু আর শুনিতেছে না। একবার হঠাৎ চমকাইয়া সে শুনিল মা বলিতেছে, সেদিন সুজাতার মা—

তাড়াতাড়ি অরুণাংশু জিজ্ঞাস করিল, কার মা?

মা কহিলেন, ঐ তো বাদলের মা।

মাকে নিয়া আর পারা যায় না। স্পষ্ট সে শুনিয়াছে আরেক-জনের মা বলিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিতেই ঘুরাইয়া বলিল, বাদলের মা। সুজাতার মা বলিলে সে যেন আর চেনেনা,—কেমন যে করে এরা। দ্যুৎ!

হ্যাঁ, কী বলছিল বাদলের মা? আমার কথা?

নারে, আমার ডাঁটা গাছগুলো খুব ভাল হয়েছে, তাই।

অরুণাংশুর আর সহ্য হইতেছে না। এমন করিলে ভালো লাগে নাকি কারুর। অকস্মাৎ ওর পাঠানুরাগ এমনি প্রবল হইয়া উঠিল, যে আর বলার নয়। মা প্রশ্ন করিলেও ও আর মোটেই শুনিতেছে না। শুনিবে কি করিয়া,—অদরকারী প্রশ্ন কি শোনা যায় নাকি? এতগুলি প্রশ্নের মধ্যে একটাও জবাব দিবার উপযুক্ত নাই। তেমন একটা প্রশ্ন হইলে সে জবাব দিত বৈকি,—কান তার সতর্কই আছে!

সুজাতার উপরও ক্রমেই অরুণাংশুর রাগ হইতেছে। আগে তো সারাক্ষণ এই বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত,—হাসি আর কথার তোড়ে আশপাশ চারদিক মুখর হইয়া উঠিত। অথচ এখন একদম দেখা নাই। নাইবা আসিল,—ওর বহিয়া গেছে। বাড়িতে কেউ ঢুকিয়া হাসাহাসি করিলেই বরঞ্চ ওর ভালো লাগে না!

বাঃ, বেশ তো জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। রাস্তায় বাহির না হইলে জ্যোৎস্না তেমন বোঝা যায় না। ঈস্, কারুদের বাড়ির ধারে সে যাইতেছে না আরো কিছু,—বাদাম গাছটার তলায় মাত্র যাইবে সে,— আর এক পা ও আগাইবে না।

বেশ, যদি বাড়িটার সমুখ দিয়াই যায়, তবেই বা দোষ কি। বাঃ রে, পথটা ধরিয়া বেড়াইতে যাইতে পারিবে না বুঝি? কোন জানলার দিকে তাকাইতে ওর একটু মাত্রও ইচ্ছা নাই,—দালানটা কতটা উঁচু তাই শুধু চাহিয়া দেখিতেছে। নাঃ, আর বেশী দূর যাইয়া কাজ

নাই,—যেপথ দিয়া আসিয়াছে সেখান দিয়া সে আবার ফিরিয়া যাইবে।

এমন করিয়া জ্যোৎস্নার মায়া ওর চোখে আগে কখনো পড়ে নাই। রূপালী রঙ দিয়া জগতের এমন চেহারা কে করিল! পথে, বাগানে, দালানের গায়ে কী যে মন্ত্র পড়া হইল তা আর বলা যায় না। বাদামগাছের ফাঁক দিয়া একটা বাড়ি চোখে পড়ে। আর একটা জানলা। জানলার ধারে নিশ্চই একজন বসিয়া আছে। কে জানে তার গায়ে মুখে জ্যোৎস্না কত বিচিত্র ছোঁয়া দিয়াছে। একদিন ট্রেনে সেই রকম জ্যোৎস্নার পরশ দেখিয়াছিল সে।

দূর ছাই, কী যে সব ভাবিতেছে। হ্যাঁ, অম্নি সে জ্যোৎস্নায় বেড়াইতে আসিয়াছিল। শুধু বেড়ান। আর কিছু নয়। এখান দিয়া হাঁটিলেই বুঝি আর কিছু মনে করিতে হইবে। আর তাছাড়া এতে লাভই বা কী। যেটা খুব সহজ হইতে পারিত, তখন তার ঘুম ছিল মনে। ঘুম ভাঙিয়া আজ যদি চম্‌কাইয়া উঠিল, যা সোজা ছিল তা আর সোজা নাই। এমন জ্যোৎস্নায় কৃষ্ণচূড়ার পাতা স্বপ্ন তৈরী করিবে, বাদাম গাছের ফাঁকে চাঁদের এক টুক্‌রা দেখা যাইবে, মাটীতে কত যে ছবি আঁকা হইবে তার ঠিক নাই,—তখন এমন যে সব কথা ও কল্পনা মনে আসিয়া আকুলতার ভীড় করিতে পারে, 'মানবের শত্রুতে' তার সন্ধান কোনো দিনই দেয় নাই। তারা মায়ার কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। কিন্তু তার সম্বন্ধে আর কিছু বলে নাই। মায়া লাগাইবার জন্য যে জগত-সংসার তৈরী, তার আলো, তার পুরুষ, তার নারী,—কে জানিত তা!

মানবের শত্রু নারী

অরুণাংশু মায়ার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। না-পাওয়ার বেদনায় ওর চোখ দুইটা কেমনতর সজল হইয়া ওঠে, না-বলা কথার সঞ্চয় ওর বুকের মধ্যে গুমরাইয়া উঠিতেছে। ওর মানব জীবনের সূত্রপাত হইল।

দশ

আর মফঃস্বল নয়,—একদম কলিকাতা। কিন্তু সহরটা এমন কি করিয়া যে বদ্‌লাইয়া গেল, তাই বিস্ময়ের কথা। এর জনতা, এর কোলাহল এবং অতি-সজীব চঞ্চলতার সুরটা অরুণাংশুকে হঠাৎ পীড়া দিতে লাগিল। অন্ধকার আর ছায়া, একটা হয়ত বাদাম গাছ, একটু আলপনা-আঁকা জ্যোৎস্নার জন্য ওর মনটা তৃষিত হইয়া ওঠে। এমন কি ট্রামে চলিতেই হঠাৎ বা ঘুঘুর ডাক শুনিতে পায়, এবং এমন সব জংলাফুলের গন্ধ আসে যা কলিকাতায় কল্পনা করাও যায় না। আর তার সাথে একজনার কথা মনে পড়িয়া মনটা কেমন উদাস হইয়া ওঠে; একটু স্বপ্ন, একটু শিহরণ, নিদ্রাহীন রাতে চোখের একটু সজলতা !

অরুণাংশু ঠিক জানে, এবার ঐ ছেলেটার সাথেই সুজাতার বিয়ে হইয়া যাইবে। সানাই এমন সব সুর তুলিবে যার সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। আলোর উৎসবে অন্ধকার পল্লীটা দীপ্ত হইয়া উঠিবে। আনন্দ-কলরব শোনা যাইবে! সুজাতার বিবাহ-ধূমারুণ মুখটা স্পষ্ট দেখিতে পায় অরুণাংশু। তারপর আর কিছু নাই। একদিন হয়ত তারই জন্য সুজাতার মনে একটু স্নেহ-রঙিন ছোঁয়া লাগিয়াছিল,—নববধূর অবগুণ্ঠন তারও উপর যবনিকা টানিয়া দিবে। দুদিনের জন্য যদি একটু স্বপ্ন রচনা হইয়া থাকে, কার বা মনে থাকিবে সে কথা! সুজাতার মনে যদি কখনো একটু রঙ

লাগিয়া থাকে তা বিস্মরণের দিগন্তে লীন হইয়া যাইবে,—দিন শেষের অস্তসোনার মত। তখনো সেই নিস্তব্ধ সহরটার সেই শান্ত পথটায় বাদামগাছটা দাঁড়াইয়া থাকিবে, ঘুঘু ডাকিবে, ছায়া পড়িবে, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে চানাচুরঅলার কেরোসিনের বড় শিখাটা একটুক্ষণের জন্য চারদিক আলো করিয়া তুলিয়া, পথের বাঁক ঘুরিলেই একদম ঢাকা পড়িয়া যাইবে।

অরুণাংশু ক্রমেই আন্‌মনা হইয়া পড়িতেছে। এবং তার ফলে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিতেছে যার বর্ণনা দিতে গেলে ওর মনের সত্যিকারের অনুভূতির গভীরতাকে হাল্কা করিয়া তোলা হয়। একটা বলিতে-না-পারা অস্বস্তি, ও একটা উপায়হীন ব্যথায় ওর মন ভরা।

মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, চোখ মুখ বুজিয়া কাউকে একটা চিঠি লিখিয়া দেয়। কিন্তু রাত করিয়া যদি সে চিঠি লেখাও হয়, তবু দিনে আর সেটাকে ডাকে দেওয়া হয় না। দিনের বেলা মানুষ অসহজ হইয়া ওঠে,—কবির জায়গায় সমালোচক আসিয়া আসন নেয়। একসময় যে-সব সাধুসন্ন্যাসীর আড্ডায় অরুণাংশু ঘুরিত, সে সব পথেও আজকাল কেউ তাকে দেখে না। বৈরাগ্যের পথ হইতে সে ছিট্‌কাইয়া জীবনের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। তার আর মায়াপাশ ছেদনের মন্ত্রের প্রয়োজন নাই। একটু কাঁদিতে পারিলেই যেন সমস্ত আত্মা পরম তৃপ্তিতে জুড়ায়।

অরুণাংশু অস্থায়ীভাবে এক কলেজে পড়াইতেছে। বাড়ি হইতে ঠিক করিয়া বইপত্র দেখিয়া যাওয়া দরকার! কিন্তু রাত্রে পড়িতে

বসিলে যত রাজ্যের কল্পনা আসিয়া মাথায় ভীড় করে,—চোখ ঝাপ্সা হইয়া ওঠে, মনের মধ্যে এমনি সব পাতা নড়িতে থাকে, এবং এমনি সব প্রলাপ বকা সুরু হয়, যে বইয়ের পাতা মুড়িয়া চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

অরুণাংশু অনেক সময় একা বসিয়া ভাবে, কেন এমন হয়। কিন্তু তার কোনো জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অপরিচয়ের অন্ধকারে একটী অজানা মেয়ে ছিল, হঠাৎ একটুক্ষণের আলোয় তাকে দেখা গেল, তারপর আবার অন্ধকার। অথচ তারই ক্ষণিক পরিচয়ে মন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, কল্পনার আর শেষ নাই, এবং চোখে জল ভরিয়া ওঠে।

যতই দিন যায়, অরুণাংশুর শুধু একটীমাত্র ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। জগতের কত সহস্র বৈচিত্র্য, কত সংখ্যাতীত সমস্যা, কিছুই আর তার চোখে পড়ে না। জগতে শুধু এক সমস্যা, একটী চাওয়া, একটী মাত্র স্বপ্ন। আর কিছু নাই,—থাকিলেও তাহা একান্তই অবান্তর।

কিন্তু কল্পনা আর বেদনা ছাড়া আর কি যে করা যাইতে পারে, তা অরুণাংশু ভাবিয়া পায় না। অরুণাংশু কবি হইলে কবিতা লিখিত। কিন্তু মনে প্রকাশহীন ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছু নাই। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধবের কাছেও একথা বলিতে ওর লজ্জা করে। আর বলিলেই কি তারা বুঝিবে,—হাসিবে কেবল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সময়ই অরুণাংশু বাড়ি ফিরিয়াছিল।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে কিনা, বাহিরে থাকিলে তা জানা যায় না।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। জান্‌লা দিয়া একখণ্ড জ্যোৎস্না আসিয়া ভিতরে এক গাল হাসি সুরু করিয়াছে।

অরুণাংশু নিঃশব্দে আসিয়া তার পাশে দাঁড়াইল। যেন এক তীর্থযাত্রী, কোন্ এক পুণ্য সলিলের সন্মুখে আসিয়া স্তব্ধ-সম্ভ্রমে নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া আছে। কোনো ব্যাকুলতা নাই, আছে মুগ্ধতা। এক মিনিট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে অরুণাংশু নিজের হাতটা বাড়াইয়া দিল। তারপর আরো, আরো,—তার সমস্ত বাহু। তারপর সমস্ত দেহ,—তার সমস্ত মন। তার মন আর এখন বৈরাগ্য কঠিন নয়,—জীবনের মন্ত্রে সে সহজ হইয়া উঠিয়া সবার সঙ্গেই সুর মিলাইতে পারে। তার সব কিছুতেই আত্মহারা হইবার দিন আসিয়াছে। অনুভূতির তীব্রতায় সব মানুষই কবি হইয়া ওঠে।

কতক্ষণ যে অরুণাংশু এমনি আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিত কে জানে। সহসা রাস্তা হইতে ঢোল-ঢাকের বাজনা কানে আসিতে সে চমকিয়া উঠিল। উঠিয়া আসিয়া জান্‌লা দিয়া চাহিয়া দেখে, একটা বিবাহের শোভাযাত্রা চলিয়াছে,—বাদ্য, আলো, দর্শক। তারপর ফুল-ঢাকা মোটরে বর আর কনে। অরুণাংশু হঠাৎ বারবার শিহরিয়া উঠিল। কে জানে এখান হইতে দুশো মাইল দূরে, মফঃস্বলের এক স্বপ্ন-ছাওয়া সহরের একটা অনতি-প্রশস্থ রাস্তা দিয়া, কৌতুহলী দর্শকদের চোখের সমুখে ঠিক এই সময়েই আর এক বর এবং আরেকটী অবগুণ্ঠিতা নম্র বধূ যাইতেছে কিনা। অসম্ভব কিছুই নয়,— আজ তো বিবাহের তারিখ দেখা যাইতেছে, হয়ত শুভদিনই হইবে।

ইজিচেয়ারটাতে গিয়া অরুণাংশু এলাইয়া পড়িল। অনেকদিন

হয় সে বাড়ির চিঠি পায় না,—নইলে হয়ত বা খবর পাইত। যাক্, স্বপ্ন, যা ছিল তাহাও আর বজায় রহিল না,—জাগরণের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নিজেকে প্রবোধ দিবার অদ্ভুত পন্থা অরুণাংশুর! সে ভাবিতেছে, ঠিকই তো, একজনের না-পাওয়ার বেদনা পাইতেই হইত। স্বার্থপরের মত সে নিজের দুঃখটাই সব চাইতে বড় করিয়া দেখিতেছে কেন?

উপন্যাসে একজন নায়ক আর একজন তার প্রতিদ্বন্দী থাকে। প্রতিদ্বন্দী সব সময়েই পাজী লোক হয়,—তার জন্য লোকের সহানুভূতিও হয় না। কিন্তু জীবনে সত্যই কি তা হয় নাকি? অরুণাংশুর আজ মনে হইতেছে, জগতের বহু সাহিত্যিক কত লোকের উপরই যে অবিচার করিয়াছে, তার ঠিক নাই। শুধু ব্যর্থ-প্রেমের বেদনা নয়, তাদের অপযশের কলঙ্ক দিয়া কত সহানুভূতিহীন পাঠকের কাছে তারা উপস্থিত করিয়াছে। এই হতভাগ্যদের অনেকেরই হয়ত আন্তরিকতা কম ছিল না, মনের বাসনায় তারা হয়ত উপায়হীন বেদনাতে কত ঘুম-হারা রাত কাঁদিয়া কাটাইয়াছে, কিন্তু তাদের ব্যর্থ-সাধনার দাম কেউ দিল না। তাদের অখ্যাতি এক শতাব্দী আর এক শতাব্দীর কাছে পৌঁছাইয়া দিল।

চোখে হাত দিয়া এক সময় অরুণাংশু চমকাইয়া উঠিল,—এ কী, গাল বাহিয়া এত অশ্রু পড়িল কখন্?

যাঃ, কী সব ভাবিতেছে সে। আর সুজাতার যে বিয়ে হইয়া গেছে তাই বা সে ভাবিতে যায় কেন? নিশ্চয়ই তবে জানা যাইত।

আগের চিঠিতে সে জানিয়াছে, সুজাতা এখনও ওখানেই আছে। কলেজ তো কবে খুলিয়াছে, তবু ওখানে কেন? ওর এখন আসিয়া পড়াই উচিত। কে জানে এখানে আসিলে কোনো দিন কোথাও দেখা হইয়া যাইবে কিনা! নিউ মার্কেট্, সিনেমার বাড়ি,—হ্যাঁ, অরুণাংশু এখন বিস্তর টকিজ্ শুনিতেছে,—কত জায়গায়ই তো দেখা হইতে পারে। তাছাড়া শুনিয়াছে, প্রায় শনিবারই সুজাতা ওর দাদা-মশায়ের বাড়ি যায়। সে বাড়িটা কোন্ রাস্তায়, অরুণাংশু তা জানে। কিন্তু এতই যখন সুজাতা দেরী করিতেছে, তখন কে জানে কি অনর্থ হইয়াছে। সুজাতার সম্বন্ধে রেণুর আরেকটু বেশী করিয়া লেখা উচিত,—কী বোকা মেয়ে,—ভাবে এ খবরটা বুঝি অরুণাংশুর কাছে একদম অবান্তর আর অ-দরকারী। তবে আশা করা যায়, তেমন কিছু আর হয় নাই এর মধ্যে! কিন্তু যতই অরুণাংশু নিজেকে বোঝাক্, ওর নিতান্তই ভয় হইল। কে জানে হয়ত সত্যই আজ সুজাতার বিয়ে হইয়া গেল। সত্যই যদি তা হয়, তবে কী হইবে! ওরে, কী করিবে তবে সে? ধ্যেৎ, মাথা গরম করিতেছে কেন মিথ্যেমিথ্যি। আজ হয়ত সারারাত আর ঘুম আসিবে না।

মাত্র দিন পনেরো হইল কলিকাতা আসিয়াছে। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা উঠিয়াই সে ভাবিল,—ঈস্, মাকে অনেকদিন দেখা হয় নাই। চিন্তা করিয়া মাকে দেখিতে যাইবে সে একরকম ঠিকই করিয়াছে। তা হইলই বা পনেরো দিন,—মাকে মাঝে মাঝে যাইয়াই দেখিয়া আসা উচিত। এতদিন সে এতটা মাতৃভক্তি বোধ করে নাই, সেটা অবশ্য সত্যি কথা কিন্তু ভুল শোধ্রান সবারই উচিত। হ্যাঁ,

নিশ্চয়ই, মাকেই তো দেখিতে যাইতেছে সে। নইলে আবার কাকে!

বিস্তর দ্বিধা করিয়াও সন্ধ্যার পরেই অরুণাংশু ট্রেনে চাপিয়া বসিল। মা কি সামান্য নাকি? বিদ্যাসাগর সেই একবার মাতৃভক্তি দেখাইয়াছিল,—আর তারপরই অরুণাংশু দেখাইতেছে। ওকে সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে হইল না বটে, কিন্তু জুতোর এক পাটী হারাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজে সে পরদিন ঠিকঠিকই গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া গেল। এবং জীবন-মরণ পণ করিয়া আবার সেই অশ্ব-আকর্ষিত কাঠের সিন্ধুকে ঢুকিয়া পড়িল।

মা ভারী আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু চিঠি লেখার মোটেই সময় ছিল না। তাছাড়া কী রকম চিঠি লেখা উচিত হইত, তাও একটা ভাবনার কথা।

বাড়ি পৌছাইয়া গাড়ি-বারান্দাটা পার হইয়া দেখে সমুখের দরজাটা বন্ধ। এত বেলায়ও ঘুম ভাঙ্গিয়া ওঠে নাই নাকি কেউ। কুম্ভকর্ণের হাওয়া লাগিয়াছে নাকি গায়ে? মা তো খুব ভোরেই ওঠে। অরুণাংশু বুঝিল মা জাগিয়াছে নিশ্চয়ই। কাজও তার সুরু হইয়াছে। শুধু সমুখের দরজাটা এখনো খোলা হয় নাই।

দরজা ধাক্কাইয়া সে ডাকিল, মা, ওমা, খুলে দাওনা দরজাটা, —তোমার লক্ষ্মী ছেলে এসেছে।

ভিতরে একটা পদশব্দ। তারপরই বোঝা গেল দরজা খোলা হইতেছে। সহসা চীৎকার করিয়া মাকে আঁৎকাইয়া দিবে নাকি? যাক্, তাঁর আর দরকার নাই, তাকে দেখিয়া অমনি মা কেমন যে চমকাইয়া উঠিবে, তা আর বলা যায় না।

দরজাটি খুলিল। অরুণাংশু বলিতে গেল, মা। কিন্তু দীর্ঘ এক জোড়া গোঁফ দেখিয়া ঘাব্ড়াইয়া গেল। কোথায় মা,—বাড়ির মালি শিবশরণই দরজাটা খুলিয়া দিয়াছে। এ ঘরে তো চাকর-বাকররা শোয়না কখনো, ব্যাপার কী?

মা ঠাক্রুণ চলে যাবার সময় তোকে এ-ঘরে থেকে জিনিষপত্র পাহারা দিতে বলে গেছেন? কোথায় চলে যাবার সময়রে? বাড়ি নেই নাকি মা। কেউ নেই? সবাই চলে গেছে? কোথায় গেছে তাই বল্না, গাধা কোথাকার,—মূর্খের মত হাস্ছে,—আমি জানব কি করে? কলকাতার থেকে এখানকার সব কিছু দেখা যায় নাকি? কলকাতায়? কবে গেছে? কা'ল রাত্তিরে?

অরুণাংশু ভাবিয়াই পাইল না, কলিকাতায় যাইবার হঠাৎ কোন্ প্রয়োজন হইল। বিশেষতঃ কোন চিঠিই সে পায় নাই। তাছাড়া এই লোকটা ছাড়া, চাকর বাকররা পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছে। অসুখ বিসুখ হয় নাই তো কারুর। মালিটাকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল মোটেই কারুর অসুখ বিসুখ নয়। এবং মালিটার ইচ্ছা অসুখ বিসুখ শুধু মাত্র বাবুদের শত্রুদেরই এক চোটিয়া হোক্। অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হইতেছে কাণ্ডকারখানা।

এমন অবস্থায় প্রসন্নবাবুর বাড়ি যাইবার অত্যন্ত সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। আর ব্যাপারটা প্রসন্নবাবু জানিলে তাকে হয়ত ওখানেই আজ থাকিতে হইবে। হয়ত কেন, এটা নিশ্চয়। একটা সম্পূর্ণ দুপুর হয়ত কাটিবে ঐখানে,—ঐ বাড়িতে! কে জানে সুজাতা এখানেই আছে কিনা। তার থাকা অন্ততপক্ষে উচিত। নইলে আর—

কিন্তু বাদাম গাছটা পার হইতেই তার চোখে পড়িল ও-বাড়ির দরজা-জান্‌লাও সব একদম বন্ধ। অরুণাংশু আগাইয়া গেল। দেখিল, বাহিরের দরজায় একটা বিরাট্ তালা সগর্ব্বে পাহারা দিতেছে। কী হইল,—বদ্‌লী হইয়া গেল নাকি প্রসন্নবাবু? সর্ব্বনাশ! কিন্তু দূর, তাই বা কেন হইবে। এক সপ্তাহ আগেও সে চিঠি পাইয়াছে,—তাতে প্রসন্নবাবুর বদলীর কোনো কথাই লেখা নাই। তা ছাড়া সেইদিন তো আসিল এখানে! কিন্তু এ-বাড়ি ও-বাড়ি দু-বাড়িরই হইল কি? সহরটায় প্লেগ লাগিল নাকি? কিম্বা আশেপাশে কোথাও একটা আগ্নেয়গিরি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বা। নইলে সবারই এমনতর সহরটা ছাড়িবার হেতু কি? মহাভারতে বকাসুরের দৌরাত্ম্যের কথা পড়িয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের যুগ ফিরিয়া আসা সম্ভবপর মনে হয় না।

সুজাতাদের সেই বন্ধ বাড়িটার সমুখে অনেকক্ষণ অরুণাংশু অমনি হাঁটিয়া বেড়াইল। সমস্ত বাড়িটা যেন প্রায় ওর ব্যর্থ আশাকে ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু অরুণাংশুর তীর্থের মত মনে হইতেছে এখানটা,—অথচ তার আর কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না, একটী কারণ ছাড়া। সেটী শুধু এই,—কত নিদ্রাহীন রাতের স্মৃতি জড়াইয়া আছে এখানটায়।

কিন্তু শুধু স্মৃতি কপ্‌চাইয়া তো আর পেট ভরে না। ক্ষিধার চোটে ক্রমেই অরুণাংশুর পেট আর্ত্তনাদ সুরু করিল। এর কাছে প্রেম-বেদনাও হার মানে, এমনি তার দাপটা। কিন্তু নিজেদের বাড়ি ফিরিবারও উপায় নাই। মালিটা বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অরুণাংশু অত্যন্ত সজোরে তাকে মানা করিয়াছে। বলিয়াছিল, অন্য জায়গায় তার নিমন্ত্রণ আছে। হায় রে, নিমন্ত্রণ!

অগত্যা সন্ধ্যায় কলিকাতা-যাত্রী গাড়ি না আসা পর্য্যন্ত অরুণাংশুকে ডাক্-বাঙলায় কাটাইতে হইল। মিথ্যা পয়সা নষ্ট, সময় নষ্ট,—প্রসন্ন-বাবুরাও যদি থাকে এখানে! এদের কি সবারই এক সময় বেড়াইতে যাইবার সময় পড়িল না কি?

কে জানে কোথায় আছে সুজাতা,—কে জানে! হয়ত তার বিয়ে হইয়া গেছে, হয়ত—! এই জীবনে আর কোন দিন তার সাথে দেখা হইবে কিনা তাই বা কে বলিতে পারে। যার আবির্ভাবের সুর মনে দোলা দেয় নাই, তার বিদায়ের পূরবী চোখে জল ঘনাইয়া তোলে!

এগারো

সারারাত অর্দ্ধ-জাগরণ, মাঝে মাঝে ষ্টেশান্ ও চাৎকার, তারপর আকাশের এক কোণা লাল হইয়া প্রভাত, ও শীঘ্রই কলিকাতা। রাতে শুধুমাত্র ঘুমান গেল না বলিয়াই আক্ষেপ ছিল। কিন্তু যাত্রা-শেষে অরুণের মনে নানারকম ভাবনা দেখা দিল,—হঠাৎ মা বাবা সবার কলিকাতা চলিয়া আসিবার কারণ কি? বাড়ির পাহারায় যে লোকটা আছে সেটা বলিয়াছে মোটেই অসুখ নয়। কিন্তু গাঁজাখোর ব্যাটাদের বিশ্বাস কি,—যা তা একটা বলিয়া দিলেই হইল। কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকেই লোকটা যখন হাসিতেছিল তখন অসুখ বিসুখ নাও হইতে পারে।

কিন্তু কিছুই বলা যায় না। মানুষের শরীর,—রোগে পড়িতে আর কতক্ষণ। বাস্-এ চাপিয়া বসিয়া ঘুম-আমিলিত চোখে অরুণাংশু ভাবিতে লাগিল। আচ্ছা, অসুখ যদি হয়, কার অসুখ? বাবার? মা'র হয়ত। হয়ত বা রেণুকার! যা রোগা মেয়েটা,—অমন রোগা হইলে কী করিয়া যে বাঁচা যায়, এক সময় অরুণাংশুর সেটাই পরম বিস্ময়কর মনে হইত। বিচিত্র নয়,—হয়ত ওরই অসুখ। বেশী বোধ হয়, নইলে হঠাৎ আর একেবারে কলিকাতা চলিয়া আসিবে কেন?

বেণীটা যখন-তখন সজোরে টানিয়া দেওয়ার সময় মনে হয় না, কিন্তু রেণুকার জন্য মনে কতটা যে স্নেহ জমা আছে, তা এই রকম সময় মনে হয়। ঠাট্টা করিয়াই হোক আর যা করিয়াই হোক্, ওর বেণীটা বড় বেশী জোরে টানা হয়। ও কিছু বলে না বটে, কিন্তু ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক। এবার হইতে ঠিক অমনটা আর করিবে না অরুণাংশু।

কিম্বা ওসব কিছু নাও হইতে পারে। কলিকাতায় তাদের যে বাড়ি তৈরী হইতেছিল, সেটা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে প্রায়। কে জানে তারই গৃহ-প্রবেশ করিতে আসিয়াছে কিনা সবাই। একটা ভারী মজার কথা মনে পড়িয়াছে,—মাথা-খারাপ না হইলে এমন কল্পনা কারুর হয় না। হয়ত সুজাতারাও গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে মা বাবার অতিথি হইয়া আসিয়াছে। হা হা,—কী যে ভাবে আজগুবি সব, তার ঠিক নাই।

বাস্‌টা ছুটিয়া চলে,—মনও। উত্তুরে হাওয়া আসে। সবুজ ময়দানটা চোখে পড়ে। কল্পনাটা যদি সত্য হইত! নিশ্চয়ই এটা কাল সারারাত্রি জাগার ফল,—মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঐ তো একটা হাঁসপাতালের লাল উঁচু বাড়িটা দেখা যায়। কত রোগ, কত দুঃখ, কত আর্ত্তনাদ ওখানে জমা আছে। নাঃ,—আর কিছু নয়, অসুখই হইয়াছে কারুর। হয়ত রেণুকার,—কী রোগা মেয়ে, অসুখ হইলে ও বাঁচিবে তো! যারা পৃথিবীর সেরা, তাদেরই নাকি আগে মরণের ডাক আসে,—তারা, যারা শুধুমাত্র ক্ষণিকের জন্য শাপগ্রস্থ হইয়া ধরণীতে আসিয়াছিল। নিশ্চয়ই রেণুকার কিছু হয় নাই,—এমন লক্ষ্মী মেয়ে রেণুকা। অরুণাংশু ওকে একটা ফাউন্টেন্ পেন্ কিনিয়া দিবে।

বাস্-ষ্টপ্ হইতে নামিয়া একটু হাঁটিলেই বাড়ি। ভিতরে ঢুকিতে

ঢুকিতে এতক্ষণ পরে অরুণাংশুর খেয়াল হইল, ঠিক কথা, সাজাইয়া গুছাইয়া কি মাকে বলিতে হইবে তা ঠিক করা হয় নাই তো,—অপ্রস্তুত অবস্থায় যা-তা একটা জবাব দিয়া শেসে জব্দ না হইতে হয়। কোথায় গিয়াছিল অরুণাংশু? বন্ধুর বাড়িতে?—না টাটার লোহার কারখানা দেখিতে, না সুন্দরবন-যাত্রী ষ্টীমারে হাওয়া খাইতে? যে কোন একটা হইলেই হয়,—কিন্তু মুখ দিয়া যেন বাহির হইতে দেরী না হয়।

সিঁড়িতে পা দিতেই মা'র সাথে দেখা,—নীচে নামিতেছিলেন। অরুণাংশুকে দেখিয়াই তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, কোথায় গিছলি তুই?

প্রশ্ন হইলেই তার একটা জবাব দেওয়া সবার আগেকার কর্ত্তব্য। অরুণাংশু কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব বোধ করিল না! প্রশ্নের জবাব না দিয়া সে মার চেয়েও বেশী চেঁচাইয়া উঠিল, কার অসুখ?

অসুখ?

ওঃ। তবে, গৃহ-প্রবেশ কবে?

গৃহ-প্রবেশ!

না হয়, হাওয়া খেতে মধুপুর কবে যাবে?

মধুপুর!

তবে,—তবে এমন হঠাৎ এসেচ কেন তোমরা এখানে?

চিঠি পাস্‌নি বুঝি?

নাঃ।

আমার পোড়াকপাল!

মা ... হাসিলেন। কোথায় একটা সম্পূর্ণ জবাব দিবে, না তার জায়গায় হাসি,—মা'র জ্বালাতনে আর পারা যায় না।

অরুণাংশু কহিল, শুধু হাসলেই জানা যায় বুঝি হঠাৎ কেন এসেচ ?

মা কহিল, জানা যায় না বুঝি পাগলা।

নাও,—বোঝো। হাসিলে বুঝি জগতে আর কথা বোঝা যায়। তবে কথা সৃষ্টির আর দরকার ছিল কি। হাসিলেই তো হইত। তাছাড়া ক্রস্-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ অরুণাংশু কখনোই মীমাংসা করিতে পারিত না। সে চটিয়া মটিয়া বলিতে যাইতেছিল, আহা বলোই না ! কিন্তু তার আগেই মা প্রশ্ন করিলেন, তুই দুদিন ধরে কোথায় ছিলি বল তো ?

অরুণাংশু কহিল, দুদিন ?

পরশু রাতেই তো গিয়েছিলি, চাকরটা বল্লে।

হ্যাঁ, তা বটে।

কোথায় ?

কোন্‌টা বলিবে অরুণাংশু ? বন্ধুর বাড়ি, টাটার কারখানা, না সুন্দরবন-যাত্রী ষ্টীমার ? কিন্তু তাড়াতাড়ি সব ঘুলাইয়া যায়। যেখানে একটা বলিলেই একটা সদুত্তর হয়, সেখানে একেবারে তিন তিনটাই গেল জড়াইয়া। অরুণাংশুর মুখ দিয়া তাড়াতাড়িতে বাহির হইয়া গেল, সুন্দরবনের ষ্টীমারে টাটানগর, বন্ধুর বাড়িতে।

মা অবাক্ হইয়া কহিলেন, ষ্টীমারে টাটানগর ?

অরুণাংশুর অবস্থা তখন কাহিল। সারিয়া সে কহিল, তা ষ্টীমারে যাওয়া যায় বৈকি। কিন্তু আমরা প্রথমটা,—বুঝলে মা,—সুন্দরবনের ষ্টীমারে একটু বেড়িয়ে, বুঝেচ, শেষে টাটানগর।

মা কহিলেন, ওঃ।

মানবের শত্রু নারী

এক মিনিট চুপ। অরুণাংশু কি প্রশ্ন করিতে গেল, কিন্তু অগ্রসর হওয়া হইল না। মা মিটিমিটি হাসিতেছে। ব্যাপার কী? মুখে হয়তো বা গাড়ির কালি লাগিয়া বদনখানাকে খাসা দেখাইতেছে! কিন্তু এমন সময় মা কহিলেন, তোর বন্ধুবান্ধব কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে এবার শীগ্‌গির ক'রে করে ফেল,—আর তো এক হপ্তাও নেই।

বন্ধুদের নিমন্ত্রণ? সপ্তাহও নাই? অরুণাংশুর কাছে প্রথমটা এর অর্থই বোধগম্য হইল না। বোকার মত দুই তিন সেকেণ্ড বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া তারপর কহিল, কী?

মা কহিলেন, কী? কী আবার, বিয়ে।

অরুণাংশু বলে, বিয়ে? কার বিয়ে?

মা কহিলেন, কার আবার,—তোর।

অরুণাংশু ঠিক শুনিতেছে তো? না এটাও ট্রেনে রাত্রি জাগার কুফল। কিন্তু একী কাণ্ড,—এ রকম কি সত্য হওয়া উচিৎ। চিঠি নাই, পত্র নাই, এ সম্বন্ধে অরুণাংশুর মতামত জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই,—বিয়ে বলিলেই হইল! আস্পর্দ্ধা দেখ,—বিয়ে করিবে নাকি অরুণাংশু কখনো,—অবশ্য একজনকে ছাড়া। কিন্তু কোন্ জঙ্গল হইতে মা বাবা কোন্ নোলক-পরাকে টানিতে যাইতেছে, কে জানে। অবশ্য নিজের কাছে গোপন করিয়া আর লাভ নাই, অরুণাংশুর বুকটা দুরুদুরু করিতেছে। কাল তো সুজাতাদের বাড়িটা বন্ধ দেখিয়া আসিয়াছে সে। [illegible] একটু আগের কল্পনাকেও ছাড়াইয়া উঠিবে নাকি বাস্তব? স্বর্গটা [illegible]তেছে কেন,—মর্ত্ত্যে আসিয়া ছোঁয়া লাগিবে বুঝি! জীবনে স্বপ্ন কি সত্য হইয়া উঠিয়াছে কোনোদিন? এই আকস্মিকতা প্রত্যেকটা

শিরায় এম্‌নি শিহরণ তুলিয়াছে যে তার তুলনা নাই, উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অরুণাংশু চটিয়া যাওয়া আর আগ্রহ, এই দুয়ের মাঝামাঝির একটা সুরে কহিয়া উঠিল, অথচ আমাকে একবার না জিজ্ঞেস করে যার তার সাথে—

মা কহিলেন, তোর মত নিয়ে বিয়ে দিতে হলে চিরজন্ম এমনি আইবুড়োই থাক্‌তে হ'তো তোকে।

অরুণাংশু কহিল, কিন্তু—

মা কহিলেন, কিন্তু আবার কি। সুজাতার মত লক্ষ্মী মেয়ে আর পাওয়া যায় বুঝি? যা যা ফাজলামো করিস নে।

তবে সত্যি, সত্যি যে। এ কী স্বপ্ন, না যাদু, না কী এ। অরুণাংশু বিশ্বাস করিতে পারে না,—এতটা হওয়াও কি সম্ভব। তার তীব্র ব্যাকুলতা, নীরব চাওয়া, তার গভীর রাতে কাঁদা এমনি করিয়া যে সার্থক হইয়া উঠিবে, ভাবিতেই পারে নাই সে। আজ উঠুক একটা সুরের তুফান, আকাশের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্তে সাতটা রঙ্‌ ঝলমলাইয়া উঠুক, আজ নাচের দোলায় দুলিয়া উঠুক সকল সৃষ্টি চরাচর!

এখন অরুণাংশু শুধু জাগর-স্বপ্ন দেখে। আর ছ'টা দিন, তার পর,—হ্যাঁ, তারপর—। আর শুধু পাঁচ দিন, চারদিন, তিনদিন, দুদিন, একদিন মাত্র। এক একটা দিন তার শিরাগুলিকে এম্‌নি করিয়া নাচাইয়া চলে যে আর বলা যায় না। জগতের এক অপ[illegible] কোণায় এক নারী ছিল, আর সে ছিল আরেক অন্ধকা[illegible] মন্ত্রে দুজনের মিলনের লগ্ন ঘনাইয়া আসিয়াছে?

মানবের শত্রু নারী

বিয়ের দিন দুটো শুভলগ্ন আছে। মা অরুণাংশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোনটায় বিবাহে তার মত। অরুণাংশু মোটেই রাত জাগিতে পারে না,—শুধু এই রাত জাগিতে পারে না বলিয়াই আগের লগ্নে বিবাহে মত দেখায়,—আর কিছুর জন্য নয় কিন্তু। কাজে কাজেই জোগাড় সেই রকমই হইতেছে।

রেণুকার জন্য আর পারা যায় না,—কী যে ফাজিল হইয়া উঠিয়াছে, তা বলার নয়। অত জোরে ওর বেণী আর টানিবে না বলিয়া একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু সব প্রতিজ্ঞাই রাখিতে হইবে বুঝি?

রূপকথালোকের রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে,—গ্রাম, অরণ্য, তেপান্তরের মাঠ, তারপরই রাজকন্যার দেশ। এক জনহীন স্তব্ধ প্রাসাদে অবশেষে রাজপুত্রের যৌবন-স্বপ্নের দেখা মিলিল। রাজকন্যার মুখটা স্পষ্ট চোখে পড়িতেছে,—তার নাম? হ্যাঁ, তার নামও মনে হয় বৈকি। তরু-মর্ম্মরের সাথে যে নামটা শোনা যাইতেছে, নদী যে নামটী ধ্যান করিতেছে, সে নামটী—সুজাতা।

তারপর সুদীর্ঘ সাতটা দিন সপ্তম দিনে আসিয়া শানাইতে সুর তুলিল। এবং কি যে সুর তুলিল তা অরুণাংশু ছাড়া আর কেউ বুঝিল না,—এমনি ওস্তাদি সঙ্গীত সেটা।

ভোরবেলায় অরুণাংশু যথারীতি খাইতে চাহিল। অথচ যে প্রস্তাবটা না করিলেই মা অন্যান্য দিন বেজায় শঙ্কিত হইয়া উঠিত, আজ সে কথা শুনিয়াই তার বিস্ময়ের সীমা নাই। অথচ অরুণাংশু তবু তো বোঝে না। বলে, আঃ, আর দেরী ক'রোনা, পেটে আমার কী বিপ্লব সুরু হয়েছে, বোঝো না বুঝি?

মা কহিলেন, দূর্ লোভী, আজ খেতে আছে বুঝি! কিছুতেই আজ খেতে দেবোনা,—আজ খেতে নেই।

অরুণাংশু বাদানুবাদ করে। কিন্তু মুস্কিল তো ঐ খানটায়ই। মা'রা মোটেই লজিক জানে না। লজিকের উপর সম্ভ্রমও নাই। সেদিন অরুণাংশু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে পাত্র এবং পাত্রী দুজনের বাপ মা-ই যখন এক জায়গায় ছিল তখন আর কলিকাতায় আসিয়া বিবাহের কোন্ প্রয়োজন ছিল। তার জবাব হয় অত্যন্ত খামখেয়ালী, যথা, মেয়েদের নিজের বাড়ীতে বিবাহ, আর অরুণাংশুদের এই সূত্রেই নতুন বাড়ীতে গৃহ-প্রবেশ। অরুণাংশু কিন্তু সেইখানে বিবাহ হইলেই বেশী খুসী হইত। যেই রাস্তাটার বাঁক ফিরিলেই বাদামগাছ এবং তার পরই একটা হলুদে রঙের বাড়ী একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ দিয়া আড়াল করা। সেই পথটাতে তার অযুত স্বপ্ন জড়াইয়া আছে।

মা যখন কিছুতেই আর খাইতে দিল না তখন অরুণাংশু বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল। তার পরই চড়িয়া বসিল সমুখের বাস্-টায়। খাওয়ার উদ্দেশে নয়,—ইতিমধ্যে খাওয়ার কথাটা ও ভুলিয়া গিয়াছিল। অভিপ্রায়,—একটা গোপন অভিপ্রায় আছে বৈকি! নিউমার্কেটের দোকানগুলি এতক্ষণ খুলিয়াছে নিশ্চয়। একশো টাকার নোটটা আবার হারাইয়া না যায়!

একটা জিনিষ কেনা হইল, কিন্তু সেটা একজন ছাড়া বর্ত্তমানে আর কেউ জানিবে না। আর সেও জানিবে,—এখন নয়, সন্ধ্যার পরে,—রাতে। কে জানে সুজাতার এটা পছন্দ হইবে কিনা হইবে।

দোকানটা হইতে বাহির হইতেই বন্ধু অজয়ের সঙ্গে দেখা। সর্ব্বনাশ, অজয়ের কথা তো অরুণাংশু স্রেফ ভুলিয়া গিয়াছিল। নিমন্ত্রণের চিঠিও একটা দেওয়া হয় নাই ওকে। মাটি করিয়াছে,—তাড়াতাড়িতেও অজয়কে বাদ দেওয়ায় ওর লজ্জিত হওয়া উচিত।

অজয় চীৎকার করিয়া উঠিল, অরুণানন্দ স্বামী!

অরুণাংশু কহিল, চুপ, একটা কলেজ হষ্টেল নয়।

অজয় ওর পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, তারপর কি খবর,—এক যুগ হলো দেখা হয় না।

অরুণাংশু ঠিক করিল খবরটা একটু চাপিয়া রাখা উচিত। একটু পরে না হয় জানান যাইবে,—ওর উচ্ছ্বাসটা একটু কমুক, নইলে পিঠটার অবস্থা যা হইবে তা আর যাই হোক্ খুব লোভনীয় নয়।

অজয় আবার বলে, কি খবর তোর, বল না?

অরুণাংশু কহিল, খবর? নাঃ,—খবর নেই কিছু।

অজয় কহিল, চল্ না আমার সঙ্গে টিটাগড়ে,—দুপুরটা কাটিয়ে আসবি। দরকার আছে কিছু?

অরুণাংশু কহিল, কিছু নেই,—মোটেই কিছু নয়। কিন্তু একেবারে টিটাগড়?

ওঃ, তাতে কি হয়েছে। ইউ নো, আই হ্যাভ্ গট্ এ কার্। মোটরে যেতে আর কতক্ষণই বা লাগে।

মন্দকার প্রস্তাব। মা খাইতে দিল না, বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া এক পেট খাইয়া জব্দ করিবে মাকে। আর অজয় খাওয়ায় খুব ভাল। কিন্তু ব্যাপার হইতেছে, কাছাকাছি জায়গা তো নয়, একেবারে টিটাগড়!

অজয় কহিল, কিরে, ভয় পেয়ে গেলি নাকি। চল্‌না,—যে সময় তোর ইচ্ছে মোটর করেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব,—পেট্রলের পয়সাও চাইব না।

অরুণাংশু কহিল, রাজী।

মোটরে চলিতে চলিতে অরুণাংশু ভাবিল এখনো ওকে বিয়ের কথা বলা হইবে না! খাইয়া দাইয়া দুপুরে আসিবার সময় ওকেও টানিয়া আনা যাইবে। এখন চুপ থাকিয়া গ্রামের শোভা দেখা যাক্।

অরুণাংশুর আর আক্ষেপ নাই। বিস্তর খাওয়া হইল। মার কাছে গিয়া সবিস্তারে ওর একটা বর্ণনা দিতে হইবে। দু-একটা পদ বাড়াইয়া বলিতেও আপত্তি নাই। যতটা বেশী খাওয়ার কথা বলিবে, মা ততটা বেশী জব্দ।

খাওয়ার পরে অজয় কহিল, দশ মিনিট আমি ঘুমিয়ে নিচ্ছি, তারপরই অ্যাট্ ইওর সার্ভিস্। খাওয়ার পরে দশ মিনিট না ঘুমোলে আমার চলে না।

অরুণাংশু কহিল, বেশ।

অজয় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পরক্ষণেই নাক ডাকাইতে লাগিল। অরুণাংশু খবরের কাগজটা চোখের সম্মুখে তুলিয়া আর একটা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়াছে। দশ মিনিট পরেই যাত্রা করিতে হইবে। বিয়ের আগে কী কী সব করিতে হয়,—এখানে আসা আজ ঠিক উচিত হয় নাই!

চমৎকার ইজিচেয়ারটা। দুপুরটায় সাড়াশব্দ নাই। খাওয়া হইয়াছে যথেষ্টের চাইতেও অনেক বেশী! শীঘ্রই অরুণাংশুর চোখ

ঢুলিয়া আসিল। তারপরই চোখ বুজিয়াছে। এবং একটা শাঁখের শব্দে চম্‌কাইয়া চোখ মেলিয়া দেখে, একী সর্ব্বনাশ, পশ্চিমের আকাশে অস্তগত সূর্য্যের শেষ রঙের রেখাগুলি টানা, আর গাছের ধারে ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অরুণাংশু লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। এ কী, এযে সন্ধ্যা আঁধার করিয়া আসিতেছে।

কী সর্ব্বনাশ ঘুমে পাইয়াছিল তাকে!

অজয় কহিল, কী রে, চমকিয়ে উঠ্‌লি কেন?

অরুণাংশু চীৎকার করিয়া কহিল, মোটর, শীগগির মোটর আন। আর একটি সেকেণ্ড দেরী নয়,—শীগগির।

চা না খেয়ে?

দুত্তোর চা,—ওরে আমার বিয়ে আজকে।

বিয়ে! তোর?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কথা নয়। পেট্রল আছে তো ভরা,—আলো আছে তো ঠিক। ঘণ্টায় ক'মাইল পর্য্যন্ত চলতে পারে তোর গাড়িটা?

হুঁ হুঁ করিয়া মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। পঁয়ত্রিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ,—আরো বেশী, ষাট্‌,—স্পীডোমিটারে অঙ্কটা লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িতেছে। একেবারে, 'কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী' ভাব অরুণাংশুর। মাকে জব্দ করিতে গিয়া এমন জব্দটাও তাকে হইতে হইতেছে।

এদিকে দুই বিয়ে বাড়ির লোকদের অবস্থা তো সঙ্গীন। অরুণাংশুর মার চিরকালই সন্দেহ ছিল তার ছেলের সংসারে আসক্তি কম।

গৌতমকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়া যে-পাশে আটকাইবার প্রয়াস ছিল অরুণাংশুর মায়ের মনের ইচ্ছাটাও ছিল অনেকটা সেই ধরণের। গৌতম বিবাহের পরে পালাইয়াছিল,—অরুণাংশু কি তার আগেই সংসার ছাড়িল না কি ?

সে রাতে অরুণাংশুর বিবাহ হইল না, এমন নয়। আগের লগ্নটা পার হইয়া গেলেও বেশী রাতে আর একটা ছিল। কিন্তু হায়, বিবাহের ইতিহাসে বিবাহের দিন বরকে এমনতর সবাই বকিবে, এমন শোনা যায় নাই। কিন্তু অরুণাংশুর কিছুই সহজে হয় না। ও যতই বুঝাইতে চায় যে ওর দোষ এতে মোটেই ছিল না, ততই এরা সব অবুঝ হইয়া ওঠে। কিন্তু সব চেয়ে রক্ষার কথা আর একটা লগ্ন আছে।

বিয়ে বাড়িতে শানাই আবার জোর করিয়া উঠিল। আলো, কোলাহল, উলুধ্বনি, তারপর শুভদৃষ্টি। এ কী সুজাতার মুখ, না স্বপ্ন একটা। এমন দুটী চোখের জগতে আর তুলনা নাই। এ কী যে দেখিল এবং কী যে না দেখিল অরুণাংশু তাহাই প্রায় ভাবিতে পারে না। প্রথম যৌবন-বিহ্বল রাতে যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, আজ এই শুক্লারজনীতে তাহা সত্য হইয়া উঠিল। স্বর্গ এতদিন পরে মর্ত্যে ঠেকিল আসিয়া।

যাক্, বিয়ে হইয়া গেল।

কিন্তু কুসুমে যেমন কীট, চাঁদে যেমন কলঙ্ক এবং মাছে যেমন কাঁটা, তেমনি বিয়ের সঙ্গে আছে রঙ্গ-পরিহাস। চারদিকে ভীমরুলের মত

মানবের শত্রু নারী

একরাশ নারী তাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ক্রমাগত কথার হুঁল ফুটাইতে লাগিল। কথা খুঁজিয়া না পাইলে অরুণাংশুর হাতটা নিশপিশ করিতে থাকে,—একটা ঠিক মত জবাব দেওয়ার চাইতে একখানা ঘুষি বসাইয়া দেওয়া ঢের সোজা। কিন্তু উপায় নাই কিছু,—মেয়েরা ঘুষি-অস্পৃশ্য! মেয়েদের এদিক দিয়া বেশ সুবিধা আছে।

বিয়ের বাড়ির ঝড় অনেকটা কাটানো গেছে। আজ কাল সময় পাইলেই অরুণাংশু পরিহাসের জবাব শানাইয়া রাখে,—কিছু উন্নতি হইয়াছে। এমন সময় একদিন ঠোঁট ঘুরাইয়া, বাঁকা কটাক্ষ্য হানিয়া শ্রীমতী সুজাতা কহিল, কী—ই?

অরুণাংশু গম্ভীর হইয়া কহিল, কি।

'কি সন্ন্যেসী ঠাকুর, নারী মানবের কি হয়?'

'শত্রু'।

ঈস্! তবে যে বড় আবার বিয়ে করা হলো।

অরুণাংশু গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কহিল, শত্রুকে চোখে চোখে রাখা নিরাপদ,—স্বামী প্রস্তরানন্দ বলে গেছেন। বিবাহের বন্ধন দিয়ে বন্দী করে রেখে দিলুম।

'বটে,—কে বন্দী করে দেখাচ্চি', বলিয়া সহাস্যে সুজাতা অগ্রসর হইল।

অরুণাংশু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, হায় স্বামী প্রস্তরানন্দ, হায় তার পুস্তক!

সমাপ্ত

